NARIDER SRISTO SAHITYA

MA [Bengali]

Fourth Semester

BNGL 1002C

Directorate of Distance Education

TRIPURA UNIVERSITY

Reviewer

Dr. Ruma Ghosh

Associate Professor, Department of Bengali, Sree Gopal Banarjee College

Author: Aniruddha Biswas, Assistant Professor, Department of Bengali, Sree Gopal Banarjee College

Copyright © Reserved, 2018

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

সিলেবাস বই ম্যাপিং টেবিল

সিলেবাস	বইম্যাপিং
প্রথম একক :	**একক -১**
আত্মজীবনী :	পৃষ্ঠা (1 - 20)
দ্বিতীয় একক :	**একক - ২**
নির্বাচিত কবিতা	পৃষ্ঠা (21 - 52)
তৃতীয় একক :	**একক - ৩**
নির্বাচিত গল্প	পৃষ্ঠা (53 - 88)
চতুর্থ একক :	**একক - ৪**
উপন্যাস	পৃষ্ঠা (89 - 120)

সূচীপত্র

প্রথম একক : আত্মজীবনী **পৃষ্ঠা (1 - 20)**

আমার কথা : বিনোদিনী দাসী

দ্বিতীয় একক : নির্বাচিত কবিতা **পৃষ্ঠা (21 - 52)**

শোকগাথা : অনঙ্গমোহিনী দেবী

প্রনয়ে বাধা : কামিনী রায়

পরমেশ্বরীকে : কবিতা সিংহ

প্রতিধ্বনি কেঁপে ওঠে : দেবারতি মিত্র

ভালোবাসা ৩, ৪ : নবনীতা দেবসেন

তবু ফিরব : তসলিমা নাসরিন

ছেলেকে হিষ্ট্রি পড়াতে গিয়ে : মল্লিকা সেনগুপ্ত

তৃতীয় একক : নির্বাচিত গল্প **পৃষ্ঠা (53 - 88)**

পেনেটিতে : লীলা মজুমদার

তিমির সম্ভবা : জ্যোতির্ময়ী দেবী

অন্ত:সলিলা : সাবিত্রী রায়

আইন : প্রতিভা বসু

পত্র পরিচিতা : আশালতা সিংহ

ঘেন্না : সুলেখা সান্যাল

দ্রৌপদী : মহাশ্বেতা দেবী

প্রগতি : সুচিত্রা ভট্টাচার্য

চতুর্থ একক : উপন্যাস **পৃষ্ঠা (89 - 120)**

সুবর্ণলতা : আশাপূর্ণা দেবী

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মুখবন্ধ / ভূমিকা

টিপ্পনী

নারীদের সৃষ্ট সাহিত্য' শির্ষক বইটি চারটি এককে বাংলা সাহিত্যের চারটি ধারা আলোচিত হয়েছে। আত্মজীবনী, কাব্যকবিতা, ছোটগল্প ও উপন্যাস নিয়ে এ গ্রন্থটি সম্পূর্ণ। প্রথম এককে আছে বিনোদিণী দাসীর রচিত আত্মজীবনী 'আমার কথা'। এ গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। বিশেষত বাংলা থিয়েটারের প্রথম যুগের ইতিহাস এ লেখায় উঠে এসেছে। সেই সঙ্গে একজন বারবণিতার কলমে যে সে যুগের লক্ষণ এমনভাবে চিত্রিত হতে পারে তা অভাবনীয়। এই গ্রন্থে নিখুঁত সামতানামি হয়তো নেই, কিন্তু বাংলা থিয়েটারের প্রথম যুগ তার অন্দরের কোন্দল, লোভ, মঞ্চনির্মাণ অভিনয়, দর্শক আনুকূল্য - এই সমস্ত দিক চমৎকার আন্তরিকতায় ধরা পড়েছে নটী বিনোদিনীর কলমে। এর সঙ্গে বিনোদিনীর হতাশ, ক্ষোভ, অপ্রাপ্তি জীবনের ট্র্যাজেডি খুব মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। সর্বোপরি লেখক বিনোদিনীর আবিষ্কার হল এ গ্রন্থের মাধ্যমে সমকালে তো বটেই ভবিষ্যতের জন্যও বিনোদিনী রেখে গেছে গ্রন্থটি।

নির্বাচিত কবিতা রাখা হয়েছে দ্বিতীয় এককে। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রায় প্রথম দিককার মহিলা লেখকদের কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পাঠ্যসূচীতে। তার ফলে জানা যাচ্ছে ত্রিপুরার রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবীর কবিতাকে। বোঝা যাচ্ছে তাঁর রচনার উৎস। পাওয়া যাচ্ছে পর্দাশীল ও সংস্কারচ্ছন্ন সময়ের মেয়েদের কবিতা। কামিনী রায়, কবিতা সিংহ, দেবারতি মিত্র, নবনীতা দেবসেন, তসলিমা নাসরিন, মল্লিকা সেনগুপ্ত হয়ে একটি বৃত্ত সম্পূন্ন হয়েছে এ পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে। নারী সাহিত্যিকরা নানান প্রতিকূলতা, সমাজবন্ধন সত্ত্বেও কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন তাঁদের সৃষ্টসাহিত্যে - কবিতায়।

তৃতীয় এককে আছে বাংলা সাহিত্যের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ছোটগল্প। প্রতিটি গল্প ভিন্নস্বাদের ও সাহিত্যগুণান্বিত। একদিকে লীলা মজুমদারের সহজ সাবলীল বাংলায় রচিত পেনেটিতে, যেখানে লেখক চমক তৈরিতে খুব সফল হয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে দেশ ভাগের যন্ত্রণা, অমানবিকতা নিলে 'ঘেন্না' লিখে চমকে দিয়েছেন সুলেখা সান্যাল। তিমির সম্ভবা একা মেয়ের লড়াইয়র গল্প, অন্তঃসলিলাতে একজন মহিলা লেখকের সংগ্রাম বর্ণিত হয়েছে। আইন গল্পটি রাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থার ফাঁক ফোকড়, সমাজবিরোধীদের আস্ফালন খুব মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। তেমনি বাংলা সাহিত্যের অণ্যতম শ্রেষ্ঠ ছোঠগল্প 'দ্রৌপতী'তে মহাশ্বেতা দেবী নগ্ন করে দেখিয়েছেন লোলুপ শোষকের চরিত্র।

টিপ্পনী

আর শেষ তথা চতুর্থ এককে আছে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস আশাপুর্ণা দেবীর ‘সুবর্ণলতা’। এ এক সমাজ দর্পণ। আশাপূর্ণার বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতার আস্ফালনের বিরুদ্ধ। নারী সংসার যন্ত্রে ঘুরে ঘুরে নিজের সক - আহ্লাদ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। নিজস্ব পরিচিতি হারিয়ে ফেলে। সেই পঙ্কিলতা থেকে মুক্তির ডাক শোনায় সুবর্ণ। আপাদমস্তক সামাজিক সমস্যা ও তার থেকে নারীর উত্তরণের কথা বলেছেন তিনি এ উপন্যাসে।

প্রথম একক : আত্মজীবনী

আমার কথা : বিনোদিনী দাসী

টিপ্পনী

আনুমানিক ১৮৬৩ সালে বিনোদিনীর জন্ম হয়। মাত্র ১১ / ১২ বছর বয়সে ১৮৭৪ সালে তিনি মঞ্চে অভিনয় করেন - গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'শত্রুসংহার' নাটকে দ্রৌপদীর সখীর ভূমিকায়। মাত্র ১২ বছর তাঁর অভিনয় জীবন। এই অল্প সময়ে তিনি প্রায় ৮০ টি নাটকে ৯০ টির অধিক চরিত্রে অভিনয় করে। এই ১২ বছরে তিনি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৮৭৪ এর ডিসেম্বর থেকে ১৮৭৬ এর ডিসেম্বর, বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৭৬ এর ডিসেম্বর থেকে ১৮৭৭ এর জুলাই, ন্যাশনল থিয়েটারে ১৮৭৭ এর জুলাই থেকে ১৮৮৩ র জুলাই এবং স্টার থিয়েটারে ১৮৮৩ র জুলাই থেকে ১৮৮৬ -র ডিসেম্বর - এই চারটি থিয়েটারে তাঁর বারো বছরের কর্মজীবন শেষ হয়েছে। অভিনয় জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি প্রায় ৬৫ বছর বেঁচেছিলেন। কিন্তু আর ফিরে আসেননি মঞ্চে ।এই সময় তিনি লেখালিখিতেই মনোনিবেশ করেছিলেন গভীরভাবে। লিখেছেন কবিতা, ধারাবাহিক লেখা পত্রিকার জন্য এবং নিজের আত্মচরিত 'আমার কথা' । বাংলা থিয়েটারের এই মহান অভিনেত্রী ১৯৪১ সালে মারা যান।

আমাদের আলোচ্য বিনোদিনীর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'আমার কথা' । সে আলোচনাতেই সরাসরি প্রবেশ করা যাচ্ছে। এই গ্রন্থটিকে লেখক বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে লিখেছিলেন। সেই ভাগগুলো উল্লেখ করে আমরা আমাদের আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবো । গ্রন্থটির শুরুতে আছে ভূমিকা, ভূমিকার মধ্যে আছে তিনটি অধ্যায় । প্রথম অধ্যায়ের নাম 'আমার এই মর্মবেদনা - গাথার আবার ভূমিকা কি ?' এই অধ্যায়ে নিজের অন্তর্বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তিনি যে 'সমাজ পতিতা, ঘৃণিতা বার নারী' তাঁর এই মর্মবেদনা শোনার কেউ নেই বলেই তাঁর ধারণা। এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৯ বঙ্গাব্দে। তখন তিনি মঞ্চ থেকে অনেক দূরে। তাই তার উপলব্ধি হয়েছিল শেষ জীবনে এসে যে তাঁর কিছুই হ'ল না। কাজেই তাঁর মর্মবেদনা প্রকাশের আবার ভূমিকা কি ?

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

1

এরপরের অধ্যায় 'উপহার' । তার শিরোনাম 'আমার আশ্রয় স্বরূপ প্রাণময় দেবতার চরণে এই ক্ষুদ্র উপহার প্রাণের কৃতজ্ঞতার সহিত অর্পিত হইল।' এখানে মূলত বিনোদিনী তাঁর পরম আরাধ্য দেবতার চরণে এই 'আমার কথা' অর্পণ করেছেন। তিনি

আবেগাপ্লুত হয়ে বেদনাদীর্ণ চিত্তে উচ্চারণ করেছেন -

> "একদিন যে অমূল্য ধনে দুঃখিনীর হৃদয় পূর্ণ ছিল; এক্ষণে আর তাহা নাই ! অযত্নে অনাদরে তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি। সুধুই জীবনে মরণে জড়িত অশ্রুবারি মাখা জ্বলন্ত স্মৃতি আছে ! হে দেবতা ! এই তাপিত প্রাণের অশ্রুবারিই উপহার লইয়া এই অভাগিনীকে চরণে স্থান দিও , আমার আর কিছুই নাই, দেব !"

তারপরই তিনি জানান এ দেবতা কোন অলৌকিক দেবতা নয়, তিনি তাঁর কোন আশ্রয়দাতা যাঁর নাম তিনি চিরকাল গোপন করেছেন। সেই দেবতা তখন আর মর্ত্যধামে জীবিত ছিলেন না, সেই প্রিয় ব্যক্তিকেই এই উপহার দিয়েছেন।

'উপহারটি কি?' শীর্ষক অধ্যায়ের শিরোনাম 'প্রীতির কুসুম দান'। এই 'আমার কথা' গ্রন্থটি বিনোদিনী লিখে তাঁকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন সেই প্রিয় জীবিত থাকতেই। পূর্ব কথানুসারে তিনি তাঁর কথা রাখলেন। "সেই জন্যই আমার স্বর্গীয় প্রাণময় প্রীতির দেবতার চরণে 'আমার কথা' উৎসর্গ করিলাম !" তাঁর পুণ্যময় দেবতার সঙ্গে তিনি কাটিয়েছেন ৩১ টি বছর। সেই মানুষটিকেই তিনি এই উপহার প্রাণের প্রতির সঙ্গে দান করেছেন।

এরপর 'নিবেদন' অংশ 'অধীনার নিবেদন' নামে এই অংশে বিনোদিনী জানাছেন এই আত্মবিবরণী লেখার পর তিনি তাঁর নাট্যশিক্ষাগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষকে দেখতে দেন। তখন তিনি পরামর্শ দেন যে বিনোদিনী যেমন লিখেছে তেমনই যেন ছাপে । উৎকৃষ্ট লেখাই লিখেছেন বিনোদিনী, আর পরিবর্তন দরকার নেই। গিরিশচন্দ্র আরো জানান, তিনি একটি ভূমিকা লিখে দেবেন এ গ্রন্থের। সেই মত একটি ভূমিকা লেখেন গিরিশ ঘোষ। কিন্তু বিনোদিনীর তা পছন্দ না হওয়ার প্রথম সংস্করণে (১৩১৯ বঙ্গাব্দ) ছাপেন নি। যদিও ১৩২০ সনে দ্বিতীয় সংস্করণে ছাপা হয়। বিনোদিনীর পছন্দ না হওয়ার কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন -

> "লেখা অবশ্য খুব ভালই হইয়াছিল; আমার মনের মতন না হইবার কারণ, তাহাতে অনেক সত্য ঘটনার উল্লেখ ছিল না।"

পরবর্তীতে গিরিশ ঘোষ আরেকটি ভূমিকা লিখে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই তিনি মারা যান।

বাল্য জীবনের কথা কিছু কিছু তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কলকাতার এক

টিপ্পনী

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

2

'সহায় সম্পত্তিহীন বংশে তাঁর জন্ম। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের ১৪৫ নম্বর বাড়িতে। তাদের অভাবের সংসার ছিল। তাই বিনোদিনী লিখেছেন -

> "আমার মাতামহী একটি মাতৃহীনা আড়াই বৎসর বালিকার সহিত আমার পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ভ্রাতার বিবাহ দিয়া তাহার মাতার যৎকিঞ্চিৎ অলঙ্কারাদি ঘরে আনিলেন। তখন অলংকার বিক্রয়ে আমাদের জীবিকা চলিতে লাগিল।"

বিনোদিনীর মাতামহীর ঐ বাড়িতে ভাড়াটিয়াদের মধ্যে গঙ্গামণি বা গঙ্গা বাঈজী একজন সুগায়িকা বাস করতেন। বিনোদিনীর বয়স তখন ৭ - ৮ বছর। বিনোদিনীর দিদিমা গঙ্গামণিকে অণুরোধ করেন বিনোদিনীকে গান শেখাবার জন্য। বিনোদিনীর চেহারা ছিল খুবই সুন্দর। দুঃখের সংসারে এমন সুদর্শনা কিশোরী প্রায় দুর্লভ। তাই গঙ্গামণি কিশোরী বিনোদিনীকে আদর করে 'গোলাপ ফুল' বলে ডাকতেন। আত্মজীবনীতে তিনি লেখেন -

> "আমার নয় বৎসর বয়ঃক্রম, সেই সময় আমাদের বাটীতে একটী গায়িকা আসিয়া বাস করেন । আমাদের বাটীতে একখানি পাকা একতলা ঘর ছিল, সেই ঘরে তিনি থাকিতেন। তাঁহার পিতা মাতা কেহ ছিল না, আমার মাতা ও মাতামহী তাঁহাকে কন্যাসদৃশ স্নেহ করিতেন। তাঁহার নাম গঙ্গা বাইজী। অবশেষে উক্ত গঙ্গা বাইজী ষ্টার থিয়েটারে একজন প্রসিদ্ধ গায়িকা হইয়াছিল । তখনকার বালিকা - সুলভ স্বভাববশতঃ তাঁহার সহিত আমার 'গোলাপ ফুল' পাতান ছিল। আমরা উভয়ে উভয়কে 'গোলাপ' বলিয়া ডাকিতাম এবং তিনিও নিঃসহায় অবস্থায় আমাদের বাটীতে আসিয়া আমার মাতার নিকট কন্যা স্নেহে আদৃত হইয়া পরমানন্দে একসঙ্গে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।"

এই গঙ্গামণি ন্যাশনাল থিয়েটারে সেই সময় গায়িকা ও অভিনেত্রী হিসেবে খুব নাম করেছিলেন। গঙ্গামণি খুবই কোমল স্বভাবা ছিলেন। বিনোদিনীদের দুঃখ কষ্ট অভাব দেখে একদিন তাঁর দিদিমাকে ডেকে বলেন, -

> "তোমাদের বড় কষ্ট দেখিতেছি তা তোমার এই নাতনীটিকে থিয়েতারে দিবে ? এক্ষণে জলপানিস্বরূপ কিছু কিছু পাইবে তারপর কার্য শিক্ষা করিলে অধিক বেতন হইতে পারিবে।"

গঙ্গামণির এই প্রস্তাবে বিনোদিনীর দিদিমা সানন্দে রাজী হন। শেষ পর্যন্ত তাঁরই

টিপ্পনী

টিপ্পনী

চেষ্টাতে বিনোদিনী মাসিক দশ টাকা মাইনেতে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রবেশ করেন। এই ভাবেই শুরু হয় তার অভিনেত্রী জীবন। প্রথম নির্বাক ভূমিকায়, তারপর দু'একটি নাটকে সামান্য কিছু সংলাপ বলার সুযোগ আসে। ক্রমান্বয়ে তিনি অতি অল্প সময়েই নায়িকার ভূমিকায় রূপদান করার সুযোগ পান। বিনোদিনীর গড়নটি ছিল বাড়ন্ত। তাই কৈশোরের শেষ প্রান্তে এসে, ভরা যৌবনা নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য মঞ্চের কর্তৃপক্ষরা তাকে সুযোগ দেন।

মাত্র বারো বছরের অভিনয় জীবন তাঁর। তারপর তিনি কেন যে চিরদিনের মত লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেন, তা আজও রহস্যজনক। তবে অভিনেত্রীর জীবনযাপন অপেক্ষা সাংসরিক জীবনযাপনের প্রতি তাঁর বরাবরই ঝোঁক ছিল। একথা তাঁর আত্মজীবনীতে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও, পরোক্ষভাবে লিখে গেছেন। -

> "শুনিয়াছি আমারও বিবাহ হইয়াছিল এবং এ কথায় যেন মনে পড়ে যে আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় একটী সুন্দর বালক ও আমার ভ্রাতা, বালিকা ভ্রাতৃবধূ আর প্রতিবেশিনী বালিকা মিলিয়া আমরা একত্রে খেলাম করিতাম। সকলে বলিত ঐ সুন্দর বালকটি আমার বর। কিন্তু কিছুদিন পরে আর তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। শুনিয়াছি যে আমার একজন মাস্‌শাশুড়ী ছিলেন; তিনিই আমার স্বামীকে লইয়া গিয়াছিলেন, আর আসিতে দেন নাই। সেই অবধি আর তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। লোক পরম্পরায় শুনিতাম যে তিনি বিবাহাদি করিয়া সংসার করিতেছেন, এক্ষণে তিনিও আর সংসারে নাই। আমার ভ্রাতার জীবদ্দশায় আমার স্বামীকে আনিবার জন্য কয়েকবার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল। আমি একটী মাত্র কন্যা বলিয়া মাতামহীর ও মাতার ইচ্ছা ছিল যে তিনি আমাদের বাটিতেই থাকেন। কেন না তিনিও আমাদের ন্যায় দরিদ্র ঘরের সন্তান। কিন্তু তাঁহার মাসী আর আসিতে দেন নাই।"

তাঁর বালিকা জীবনের এই ঘটনার পর প্রথম যৌবনে এক ধনী জমিদার পুত্রের সঙ্গে তাঁর ভাব ভালোবাসা হয়। ঐ জমিদার পুত্র বিনোদিনীকে বিয়ে করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু আত্মীয় -স্বজনের চাপে জমিদারপুত্র অন্যত্র বিয়ে করেন। এই ঘটনায় বিনোদিনী খুবই আঘাত পান। এমন কি সেই আঘাত কাটিয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে বহুদিন পর্যন্ত সম্ভব হয় নি।

১৮৮৬ সালে যে সময় তিনি রঙ্গমঞ্চকে চিরবিদায় জানালেন, সে সময় তাঁর জীবনে চতুর্থ পুরুষের আবির্ভাব ঘটে। তিনি স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে তাঁকে তার নিজের বাড়িতে নিবে গিয়েছিলেন। জীবনের একত্রিশটি বছর গৃহবধূরূপে তাঁর সঙ্গে সংসারজীবন কাটান। এরই মাঝে বিনোদিনীর রূপমুগ্ধ গুর্ম্মুখ রায় মুসাদি নামে জনৈক মাড়োয়ারী যুবক বিনোদনীকে সঙ্গিনীরূপে পাওয়ার শর্তে গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বসুর কাছে একটি নতুন থিয়েটার করার প্রস্তাব দেন। এই থিয়েটার গড়ে তোলার ব্যাপারে গুমুর্খ সমস্ত ব্যায়ভার বহন করবেন বলে জানান। এই প্রস্তাবে ভীষণ উৎসাহিত হয়ে গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল বিনোদিনীকে গুর্ম্মুখের অধীনে থাকার অনুরোধ করেন। বিনোদিনী তাঁর আত্মজীবনীতে এ সম্পর্কে লেখেন -

> "অভিনেতারা আমাকে অতিশয় জেদের সহিত অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে, "তুমি যে প্রকারে পার একটী থিয়েটার করিবার সাহায্য কর !" থিয়েটার করিতে আমার অনিচ্ছা ছিল না, তবে একজনের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্যায়রূপে আর একজনের আশ্রয় করিতে আমার প্রবৃত্তি বাধা দিতে লাগিল । এদিকে থিয়েটারের বন্ধুগণের কাতর অণুরোধ । আমি উভয় সঙ্কটে পড়িলাম । গিরিশবাবু বলিলেন থিয়েটারই আমার উন্নতির সোপান । তাঁহার শিক্ষা সাফল্য আমার দ্বারাই সম্ভব। থিয়েটার হইতে মান সম্ভ্রম জগদ্বিখ্যাত হয়। এইরূপ উত্তেজনায় আমার কল্পনা স্ফীত হইতে লাগিল । থিয়েটারের বন্ধুবর্গেরা ও দিন দিন অনুরোধ করিতেছেন, আমি মনে করিলেই একটী নূতন থিয়েটার সৃষ্টি হয় তাহাও বুঝিলাম; কিন্তু যে যুবকের আশ্রয়ে ছিলাম, তাঁহাকেও স্মরণ হইতে লাগিল ! ক্রমে সেই যুবা অনুপস্থিত, উপস্থিত বন্ধুবর্গের কাতরোক্তি, মন থিয়েটারের দিকেই টলিল। তখন ভাবিতে লাগিলাম যিনি আশ্রয় দিয়াছেন, তিনি আমার সহিত যে সত্যে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা ভঙ্গ করিয়াছেন, অপর পুরুষে যেরূও প্রতারণা বাক্য প্রয়োগ করে, তাঁহারও সেইরূপ ! তিনি পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম সাক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে আমিই তাঁহার কেবল একমাত্র ভালবাসার বস্তু, আজীবন সে ভালোবাসা থাকিবে। কিন্তু কই তাহা তো নয় ! তিনি বিষয় কার্য্যের ছল করিয়া দেশে গিয়াছেন। কিন্তু সে বিষয় কার্য্য নয়, তিনি বিবাহ করিতে গিয়াছেন । তবে তাঁহার ভালবাসা

টিপ্পনী

টিপ্পনী

কোথায় ? এ তো প্রতারনা। আমি কি নিমিত্ত বাধ্য থাকিব ? এরূপ নানা যুক্তি হৃদয়ে উঠিতে লাগিল ! কিন্তু মধ্যে মধ্যে আবার মনে হইতে লাগিল, যে সেই যুবার দোষ নাই, আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমি তাঁহার একমাত্র ভালবাসার পাত্রী তবে একি করিতেছি। রাত্রে এ ভাব উদয় হইলে অনিদ্রায় যাইত, কিন্তু প্রাতে বন্ধুবর্গ আসিলে অনুরোধ তরঙ্গ ছুটিত ও রাত্রের মনোভাব একেবারে ঠেলিয়া ফেলিত ! থিয়েটার করিব সংকল্প করিলাম ! কিন্তু এখন দেখিতেছি আমার মন আমার সহিত প্রতারণা করে নাই। ইহা যতদূর প্রমাণ পাওয়া সম্ভব তাহা পাইয়াছিলাম .....

থিয়েটার করিব সংকল্প করিলাম। কেন করিব না ? যাহাদের সহিত চিরদিন ভাই, ভগ্নীর ন্যায় একত্রে কাটাইয়াছি, যাহাদের আমি চিরবশীভূত, তাহারাও সত্য কথাই বলিতেছে। আমার দ্বারা থিয়েটার স্থাপিত হইলে চিরকাল একত্রে ভ্রাতা ভগ্নীর ন্যায় কাটিবে। সংকল্প দৃঢ় হইল, গুর্ম্মুখ রায়ককে অবলম্বন করিয়া থিয়েটার করিলাম।"

এই কারণে বিনোদিনীর দ্বিতীয় আশ্রয়দাতা পুরুষ ও গুমুর্খ রায়ের মধ্যে বিবাদ হয়। এর ফলে বিনোদিনীকে ও থিয়েটারের সহকর্মিদের খুব বেগ পেতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গটি বিনোদিনী উল্লেখ করেছেন তাঁর লেখায় -

"কেননা যখন সেই সম্ভ্রান্ত যুবক শুনিলেন যে আমি অন্যেদর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া একটি থিয়েটারে চিরদিন সংলগ্ন হইবার সংকল্প করিয়াছি, তখন তিনি ক্রোধ বশতঃই হউক, কিম্বা নিজের জেদ বশতঃই হউক, না রূপ বাধা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে বাধা বড় সহজ বাধা নহে ! তিনি নিজের জমিদারী হইতে লাঠিয়াল আনাইয়া বাড়ী ঘেরোয়া করিলেন ; গুর্ম্মুখ বাবুও বড় বড় গুন্ডা আনাইলেন, মারামারি পুলিশ হাঙ্গামা চলিতে লাগিল।এমন কি একদিন জীবন সংশয় হইয়াছিল। একদিন রিহারসালের পর আমি আমার ঘঘরে ঘুমাইতে ছিলাম, ভোর ছয়টা হইবে, ঝ্নঝ্ন মস্ মস্ শব্দে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল ! দেখি যে মিলিটারি পোষাক পরিয়া তরওয়াল বান্ধিয়া সেই যুবক একেবারে আমার ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন যে, মেনি এত ঘুম কেন?' আমি চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিতে, বলিলেন যে, 'দেখ

বিনোদ, তোমাকে উহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। তোমার জন্য যে টাকা খরচ হইয়াছে আমি সকলই দিব। এই দশ হাজার টাকা লও ; যদি বেশি হয় তবে আরও দিব। ..... আমি বলিলাম, 'না কখনই নহে, আমি উহাদের কধা দিয়াছি, এখন কিছুতেই ব্যাতিক্রম করিতে পারিব বা।' তিনি বলিলেন 'যদি টাকার জন্য হয়, তবে আমি তোমায় আরও দশ হাজার টাকা দিব'। তাঁহার কথায় আমার ব্রহ্মান্ড জ্বলিয়া গেল ! দাঁড়াইয়া বলিলাম, যে ''রাখ তোমার টাকা ! টাকা আমি উপার্জ্জন করিয়াছি বই টাকা আমায় উপার্জ্জন করে নাই ! ভাগ্যে থাকে অমন দশ বিশ হাজার আমার কত আসিবে, তুমি এখন চলিয়া যাও' ! আমার এই কথা শুনিয়া তিনি আগুনের মতন জ্বলিয়া নিজের তরওয়ালে হাত দিয়া বলিলেন, 'বটে ! - ভেবেচ কি যে তোমায় সহজে ছাড়িয়া দি, তোমায় কাটিয়া ফেলিব ! যে বিশ হাজার টাকা তোমায় দিতে চাহিতে ছিলাম তাহা অণ্য উপায়ে খরচ করিব, পরে যাহা হয় হইবে' ; বলিতে বলিতা ঝাঁ করিয়া কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া, চক্ষের নিমেষে আমার মস্তক লক্ষ্য করিয়া এক আঘাত করিলেন। আমার দৃষ্টিও তাঁহার তরবারির দিকে ছিল, যেমন তরবারির আঘাত করিতে উদ্যত আমি অমনি একটি টেবিল হারমোনিয়াম ছিল, তাহার পাশে বসিয়া পড়িলাম; আর সেই তরবারির চোট হারমোনিয়মের ডালার উপর পড়িয়া ডালার কাঠ তিন আঙ্গুল কাটিয়া গেল। নিমেষ মধ্যে পুনরায় তরওয়াল তুলিয়া লইয়া আবার আঘাত করিলেন, তাঁর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, আমারও মৃত্যু নাই, সে আঘাতও যে চৌকিতে বসিয়া বাজান হইত তআতে পড়িল, মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি উঠিয়া তাঁহার পুনঃউদ্যত তরওয়াল শুদ্ধ হস্ত ধরিয়া বলিলাম 'কি করিতেছ, যদি কাটিতে হয় পরে কাটিও; কিন্তু তোমার পরিণাম ?' ..... হাতের তরওয়াল দূরে ফেলিয়া দিয়া মুখে হাত দিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন ! ..... তিনি কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেলেন।"

টিপ্পনী

গুর্ম্মুখ রায় মুসাদ্দি বিনোদিনীর জীবনের তৃতীয় পুরুষ, যিনি বিনোদিনীকে কাছে পাওয়ার পর, এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকা তাঁকে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিনোদিনী সে টাকার প্রলোভন ত্যাগ করে থিয়েটার গড়ে তোলার জন্য গুর্ম্মুখ রায়কে অনুরোধ

করেন। এ সম্পর্কে বিনোদিনী লেখেন -

> "আমি থিয়েটার ভালবাসিতাম, সেই নিমিত্ত ঘৃণিত বারনারী হইয়াও অর্দ্ধ লক্ষ টাকার প্রলোভন তখনই ত্যাগ করিয়াছিলেন।"

গুর্মুখ রায় বয়সে বিনোদিনীর এক বছরের ছোট। তিনি বিনোদিনীকে নিজের অধীনে রাখতে চান। বিনোদিনী পণ করেন গুর্মুখ রায় তাঁকে থিয়েটার নির্মাণ না করে দিলে কিছুতেই তিনি তার বাধ্য থাকবেন না। শেষ পর্যন্ত বিনোদিনীর উদ্যমে বিডন স্ট্রীটে জমি লিজ নিয়ে কাজ শুরু হল। বিনোদিনীর অত্যুৎসাহের আরেকটি কারণ হিসেবে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন -

> "থিয়েটার যখন প্রস্তুত হয় তখন সকলে আমায় বলেন যে এই যে থিয়েটার হাউস্ হইবে, ইহা তোমার নামের সহিত যোগ থাকিবে। তাহা হইলে তোমার মৃত্যুর পরও তোমার নামটি বজায় থাকিবে। অর্ধাৎ এই থিয়েটারের নাম 'বি' থিয়েটার হইবে। এই আনন্দে আরও উৎসাহিত হইয়াছিলাম।"

বিনোদিনী এমনই জানতেন যে তাঁর নামেই হচ্ছে এই থিয়েটার। কিন্তু ক্রমেই জানা গেল থিয়েটারটির নাম হয়েছে 'ষ্টার'। বিনোদিনী এই ঘটনাতে খুবই মানসিক আঘাত পান। তিনি লেখেন -

> "যে পর্য্যন্ত থিয়েটার প্রস্তুত হইয়া রেজেষ্ট্রি না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত আমি জানিতাম যে আমারই নামে 'নাম' হইবে ! কিন্তু যে দিন উঁহারা রেজিষ্ট্রি করিয়া আসিলেন - তখন সব হইয়া গিয়াছে, থিয়েটার খুলিবার সপ্তাহকয়েক বাকী; আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলাম যে থিয়েটারের নূতন নাম কি হইল " দাশুবাবু প্রফুল্লভাবে বলিলেন যে 'ষ্টার'। এই কথা শুনিয়া আমি হৃদয় মধ্যে অতিশয় আঘাত পাইয়া বসিয়া যাইলাম যে দুই মিনিট কাল কথা কহিতে পারিলাম না।"

বঞ্চনা করা হল বিনোদিনীর সাথে। অথচ তিনিই কি উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করেছিলেন এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠার জন্য। দিন রাত নিজে পরিশ্রম করেছিলেন শ্রমিকদের সাথে। তার উল্লেখ আছে তাঁর আত্মজীবনীতে -

> "অতি উৎসাহের ও আনন্দের সহিত কার্য্য চলিতে লাগিল। এই সময় আমরা বেলা ২/৩ টার সময় রিহারসালে গিয়া সেখানকার কার্য্য শেষ

করিয়া থিয়েটারে আসিতাম ; এবং অন্যান্য সকলে চলিয়া যাইলে আমি নিজে ঝুড়ি করিয়া মাটি বহিয়া পিঠ, ব্যাক সিটের স্থান পূর্ণ করিতাম, কখন কখন মজুরদের উৎসাহের জন্য প্রত্যেক ঝুড়ি পিছু চারিকড়া করিয়া ধার্য্য করিয়া দিতাম। শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুতের জন্য রাত্র পর্য্যন্ত কার্য্য হইত। সকলে চলিয়া যাইতেন, আমি গুর্ম্মুখবাবু আর ২/১ জন রাত্র জাগিয়া কার্য্য করাইয়া লইতাম। আমার সেই সময়ের আনন্দ দেখে কে ? অতি উৎসাহে অনেক পয়সা ব্যায়ে থিয়েটার প্রস্তুত হইল।"

টিপ্পনী

কিন্তু এক নিমেষে সকল আনন্দ তাঁর বিষাদে পরিণত হল। তিনি এই আঘাত ও সহ্য করেন। শুধুমত্র থিয়েটারকে ভলোবেসে। এরপরও তিনি অনেক সময় অনেকের কাছ ধেকে খারাপ ব্যবহার পেয়েছেন। অনেকে তাকে তাড়িয়ে দিতেও চেষ্টা করলেন। গুর্ম্মুখ রায় ও খুব রেগে গিয়েছিলেন বিনোদিনীর প্রতি প্রতারণা হওয়ায়। যাইহোক ১৮৮৩ সালের ২১ জুলাই স্টার থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হয় 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক দিয়ে। এরপর দ্বিতীয় নাটক 'ধ্রুব চরিত্র' এবং তৃতীয় নাটক 'নল দময়ন্তী' মঞ্চস্থ হয় ১৮৮৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর।

এদিকে গুর্ম্মুখের মা রূপাদেবী ছেলের চারিত্রিক অধঃপতন এবং থিয়েটারের ব্যবসা করার কথা জানতে পেরে বিচলিত হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত আত্মীয়স্বজনের চাপে গুর্ম্মুখ থিয়েটার বিক্রি করে দেন এবং বিনোদিনীর সংস্রব ত্যাগ করতে বাধ্য হন। বিনোদিনীর সঙ্গে গুর্ম্মুখের সম্পর্ক মাত্র ছ'মাসের। কিন্তু বিনোদিনীকে তিনি ভুলতে পারেননি। গুর্ম্মুখ ছিলেন বাবা - মার একমাত্র সন্তান এবং বিশাল সম্পত্তির অধিকারী। হোড় মিলার কোম্পানীর অফিসে কিছুদিন যাতাযাত করার পর তিনি চলে যান। সাধুসঙ্গ লাভ করেন এবং ১৮৮৬ সালে মাত্র বাইশ বছর বয়সে মারা যান। গুর্ম্মুখের ১৭ - ১৮ বছর বয়সে বিয়ে হয়। মৃত্যুকালে বিধবা মা রূপাদেবী, স্ত্রী লক্ষীদেবী এবং দুই শিশুকন্যা পার্বতী ও বাসন্তীকে রেখে যা। গুর্ম্মুখের মৃত্যুর পর তাঁদের বিশাল সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিকট আত্মীয়ের এক পুত্রকে লক্ষ্মী দেবী দত্তক নেন। এই পুত্রের নাম কানাইয়ালাল মুসাদ্দি। কানাইয়ালাল উত্তর কালে 'রায় বাহাদুর' খেতাব পান।এখানে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, গুর্ম্মুখের মৃত্যু ও বিনোদিনীর মঞ্চ থেকে অবসর গ্রহণ ঐ একই বছরে।

বৈচিত্র্যময় জীবন ছিল বিনদিনীর। শৈশবে দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁকে কাটাতে হয়েছে। কৈশোর থেকে যৌবন তাঁর কেটেছে অভিনেত্রীরূপে। শুধু অর্থ আর খ্যাতি নয়, সেই সঙ্গে তিনি পেয়েছিলেন সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও মনীষিদের সান্নিধ্য। সর্বোপরি শ্রী

টিপ্পনী

শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আশীর্বাদ পেয়েছিলেন তিনি। জীবনে এমন সৌভাগ্য খুব কম মানুষেরই হয়। রামকৃষ্ণদেবের প্রসঙ্গটি বিনোদিনী উল্লেখ করেছেন এই ভাবে -

> "আমার জীবনের মধ্যে চৈতন্যলীলা অভিনয় আমার সকল অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় এই যে আমি পতিতপাবন পরম হংসদেব রমকৃষ্ণ মহাশয়ের দয়া পাইয়াছিলাম। কেননা সেই পরম পূজনীয় দেবতা, চৈতন্যলীলা অভিনয় দর্শণ করিয়া আমায় তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দিয়াছিলেন। অভিনয় কার্য শেষ হইলে আমি শ্রীচরণ দর্শন জন্য যখন আপিস ঘরে তাঁহার চরণ সমীপে উপস্থিত হইতাম, তিনি প্রসন্ন বদনে উঠিয়া নাচিতে নাচিতে বলিতেন - 'হরি গুরু , গুরু হরি, বল মা 'হরি গুরু, গুরু হরি', তাহার পর উভয় হস্ত মাথার উপর দিয়া আমার পাপ দেহকে পবিত্র করিয়া বলিতেন যে, 'মা তোমার চৈতন্য হউক'।"

একসময় বিনিদিনী রঙ্গমঞ্চের শিরোনাম ছিলেন। সমস্ত প্রথমসারির বাংলা ইংরেজী পত্র পত্রিকায় তাঁর প্রশংসা করে কতই না লেখা বের হত। শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর রিজ এন্ড রায়ৎ' পত্রিকায় বিনোদিনী সম্পর্কে লিখেছেন -

> "But last not least shall we say of Binodini ? She is not only the Moon of star company, but absolutly at the head of her profession in India. She must be a woman of considerable culture to be able to show such unaffected sympatly with so many and various characters and such capacity of reproducing them. She is certainly a Lady of much refinement of feeling as she shows herself to be one of inimitable grace. On Wednesday she played two very distinct and widely divergent roles, and did perfect justice to both. Her Mrs. Bilasini Karforma, the girl graduate, exhibited so to say an iron grip of the queer phenomenon, the Girl of the period as she appears in Bengal Society. Her chaitanya showed a wonderful mastery of the suitable forces dominating one of the greatest of religious characters who was taken to be the

lord himself and is to this day worshiped as such by miblions. For a young Miss to enter into such a being so as to give it perfect expression, is a miracle. All we can say is that genius like faith can remove mountains."

এর ভাবার্থ বিনোদিনী লিখেছেন -

"ষ্টার থিয়েটারের অভিনেত্রীবর্গের মধ্যে শ্রীমতি বিনোদিনী চন্দ্রমা স্বরূপ । বলিতে কি তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত অভিনেত্রীবৃন্দের শীর্ষস্থানীয়া। বিশেষ শিক্ষিতা ও অভিজ্ঞ বলিয়া তিনি বহুবিধ চরিত্রের স্বাভবিক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তৎ চরিত্র প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন । এবং তিনি বিশিষ্টরূপ মার্জিতারুচি বলিয়া কোন অভিনেত্রীই এ পর্য্যন্ত তাঁহার মনোহারিত্ব অনুকরণ করিতে পারেন নাই। বিগত বুধবার (৭ই অক্টোবর ইং ১৮৮৫) তিনি দুইটী বিভিন্ন ও পরস্পর সম্পূর্ণরূপ বিসদৃশ চরিত্রের অভিনয় করিয়া, উভয় চরিত্রের সম্যক সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। শিক্ষিত রমণী গ্রাজুয়েড্ বিলাসিনী কারফরমার চরিত্র অভিনয়ে তিনি আধুনিক বঙ্গ সমাজের শিক্ষিতা মহিলার আদর্শরূপা, অদ্ভুত দৃশ্যের কঠোর ভাব প্রদর্শন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

আর যে চৈতন্যদেবকে ভগবান জানিয়া লক্ষ লক্ষ লোক পূজা করিয়া কৃতার্থ হয়েন, তাঁহার চরিত্রাভিনয়ে ইনি যে প্রকৃতির বহুবিধ সক্ষম শক্তির উপর প্রাধান্য রাখিয়া থাকেন তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায় । কুমারী বিনোদিনীর পক্ষে এরূপ মহাপুরুষের চরিত্রাভিনয়ে সেই চরিত্রের সম্যক বিকাশ প্রদর্শন, একপ্রকার অনৈসর্গিক ব্যাপারই বলিতে হইবে, তবে ঐশী প্রতিভা ও বিশ্বাস পর্ব্বত সদৃশ বাধা অতিক্রম করিয়া থাকে।"

এহেন বিনোদিনী চিরকালের মত আশ্রয় নিলেন অন্তঃপুরে। দীর্ঘ একত্রিশ বছর গার্হস্থ্য জীবন কাটিয়েছে কিন্তু সেই জীবন ও শেষ পোর্যন্ত তাঁর সুখের হয়নি। পঞ্চাশ বছর বয়সে বৈধব্য বেশে থান কাপড় পরে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে, আবার ফিরে এসেছিলেন ১৪৫ নং কর্ণওয়ালীস স্ট্রীটে তাঁদের পুরণো ভিটেয়। এরপর জীবনের ২৩ বছর তিনি কাটিয়েছিলেন একান্ত নিঃসঙ্গ ভাবে। ভাগবৎ চিন্তা আর

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সাহিত্যসেবায় তাঁর শেষ দিনগুলো কেটেছে। মৃত্যুর কয়েকবছর আগে নটী বিনোদিনী গেরুয়া বসন পরে সন্ন্যাসিনীর বেশে গোপালের সেবায় দিন কাটিয়েছেন। শেষে রঙ্গজগতের অগোচরে ১৯৪১ সালে ৭৮ বছর বয়সে শেষ নিৎশ্বাস ত্যাগ করেন।

অভিনেত্রী জীবনে যাঁকে নিয়ে এত আলোড়ন - বিলোড়ন, সংবাদপত্রে যাঁর অভিনয়ের সমালোচনা দিনের পর দিন প্রকাশিত হয়েছে, যাঁর অজস্র ছবি ছাপা হয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়, সেই সময়কার বড় বড় ইংরেজী সংবাদপত্রে যাঁকে 'Flower of the native stage' বলে অভিহিত করা হত, অথচ মৃত্যুর পরে তাঁর কোন শোক - সংবাদ ও প্রকাশিত হয়নি। তাঁর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বিনোদিনীকে বলেছিলেন, 'বল মা, হরিগুরু, গুরু হরি'। শেষ জীবনে রামকৃষ্ণদেবের শ্রীমুখ - নিঃসৃত এই বাণীকে বিনোদিনী বীজমন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। অভিনেত্রী জীবনে বিনোদিনী যেমন বহু বিচিত্র চরিত্রে অভিনয় করে গেছেন, তেমনি তাঁর জীবন নাট্যও বড় কম বিচিত্র নয়।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে তাঁর অভিনেত্রী জীবনের সূচনা হয়েছিল গিরিশচন্দ্র ঘোষের কাছে। ১৮৭৭ সালে ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগদানের পর, তাঁর অভিনয় - প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল। 'মেঘনাদ বধ', 'পলাশীর যুদ্ধ', 'বিষবৃক্ষ', 'রাবণ বধ', অভিমন্যু বধ', 'সীতার বনবাস', 'লক্ষ্মণ বর্জন', 'পান্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'দক্ষযজ্ঞ', 'নলদময়ন্তী', 'চৈতন্যলীলা', 'বিবাহ বিভ্রাট', 'নিমাই সন্ন্যাস', 'বুদ্ধদেব চরিত', 'বিল্লমঙ্গল', 'বেল্লিক বাজার' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে তিনি অসামান্যা অভিনেত্রী রূপে সকলের অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। শুধু এ দেশের সাহিত্যিক ও দেশবরেন্য মনিষীদের যে অজস্র প্রশংসা ও স্নেহ লাভ তিনি করেছিলেন তাই নয়, সেই সঙ্গে বিদেশী গুণী ব্যক্তিরাও তাঁর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

মহিলা লেখিকাদের মধ্যে বিনোদিনীই বোধ হয় দ্বিতীয় মহিলা যিনি বাংলা ভাষায় আত্মচরিত রচনা করে গেছেন। 'আমার কথা' আত্মচরিতে তিনি তাঁর অভিনেত্রী জীবনের যে সকল ঘটনা বিবৃত করে গেছেন, তাকে বাংলা নাট্য সাহিত্যের একটি তথ্যপূর্ণ দলিল বলা চলে। বিনোদিনী আত্মজীবনীতে এমন সব ঘটনার উল্লেখ করে গেছেন, যা নাটক, নাট্যশালা সম্পর্কে গবেষকদের কাছে বর্তমানে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্যরূপে গৃহীত হচ্ছে। এদিক থেকে বিচার করলে বিনোদিনীর আত্মচরিত কেবলমাত্র আত্মচরিতই নয়, নাট্যশালার আদি পর্বের ইতিহাসও বটে। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, যিনি মাত্র দশ - এগার বছর বয়সে নাট্যশালায় অভিনয় করতে এসেছিলেন, তাঁর এমন

সাহিত্যবোধ, এমন ভাষাজ্ঞান জন্মাল কি করে ? নাট্যকারের ভাষা আয়ত্ত করতে করতেই যে তাঁর ভাষাজ্ঞান হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আত্মজীবনী রচনার পাশাপাশি তিনি 'কনক ও নলিনী' এবং 'বাসনা' নামে দুটি কাব্যগ্রন্থ ও রচনা করে গেছেন । কোথাও ত্রিপদী, কোথাও পয়ার, কোথাও লঘু ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে ভাষা ও ভাবের সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি প্রকৃত কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়ে গেছেন।

টিপ্পনী

বিনোদিনী শুধু নটী নন । বহুবিচিত্র জীবনের অধিকারিণী । বিনোদিনী কবি, বিনোদিনী গৃহিনী, বিনোদিনী সন্ন্যাসিনী - এক নিঃসঙ্গ সম্রাজ্ঞী।

হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিনোদিনীর আত্মজীবনীটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ । উনিশ শতকের নারী প্রতিনিধিত্ব, যাঁরা সমাজ সম্পর্কে ভেবেছেন, নারীদের জীবন সম্পর্কে নিজেদের কথা নিজের মত করে বলেছেন, কিংবা নতুন কাল অথবা পুরাতন ঐতিহ্য ও সংস্কার কেমন ভাবে এসেছে বা তার কতটা গ্রহণ বর্জন করা উচিত - এজাতীয় চিন্তাভাবনা করেছেন । তারা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই উনিশ শতকের নব্যশিক্ষিত প্রগতিশীল পরিবারের প্রতিনিধি। অন্যদিকে, ইংরেজি শিক্ষিত, নব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারী প্রতিনিধি ব্যাতীতও বৃহত্তর বাংলাদেশের অন্দরের নারী প্রতিনিধি হিসেবে রাসসুন্দরী দেবী কিংবা নিস্তারিনী দেবীর লেখাতেও জীবনের অন্য অনেক দিন চিহ্নিত হয়। এদিক দিয়ে বিনোদিনীর আত্মজীবনী 'আমারকথা' ব্যাতিক্রমী একটি সৃষ্টি।

বিনোদিনীর 'আমার কথা' উনিশ শতকের অভিনয় সংক্রান্ত মূল্যবান তথ্যে পরিপূর্ণ কোন গ্রন্থ নয় । তা আত্মজীবনী । কাজেই তাতে তথ্যের ভূল থাকা স্বাভাবিক ছিলও। আবার কোন গভীর মননশীলতা ও এ গ্রন্থে নেই। গ্রন্থটি শেষ করে তিনি তাঁর গুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষকে দেখতে দিয়েছিলেন পান্ডুলিপি। সেটি পড়ে গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন -

> "তোমার সরলভাবে লিখিত সাদা ভাষায় যে সৌন্দর্য্য আছে, কাটাকুটি করিয়া পরিবর্ত্তন করিলে তাহা নষ্ট হইবে । তুমি যেমন লিখিয়াছ, তেমনি ছাপাইয়া দাও । আমি তোমার পুস্তকের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিব।"

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে বিনোদনীর লেখায় ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় 'সরলভাবে' ও 'সাদা ভাষায়' উপস্থাপিত হয়েছে । আর একদিক দিয়ে দেখা যায় 'আমার কথা' ত্রিমাত্রিক ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ । প্রথমত, উনিশ শতকের আলোকিত নারীরাও নানা দিক দিয়ে সংকুচিত পরিসরে বিচরণ করেছেন। অন্দরের প্রবল বাধা ঠেলে

টিপ্পনী

তরারা সম্পূর্ণ নিজেদের মুক্ত করতে পারেন নি। তাছাড়া তাদের পরিবারের সঙ্গে সাধারণ পরিবারের পার্থক্য অনেকখানি। ছোটখাট ঘটনা বা সুখ দুঃখ তাঁদের অগোচরেই থেকে গেছে। আবার খুব সাধারণ পরিবারের নারীরা কেবলমাত্র সংকীর্ণ পরিসর অন্দেরর প্রতিনিধি। তাঁদের পক্ষে অন্দর ঠেলে সদরের আলো কিংবা অন্ধকার, ঘৃণ্য কিংবা প্রশংসনীয় জগৎ - জীবনকে দেখা সম্ভব ছিল না। এদিক দিয়ে বিনোদিনী সদর জীবন ও জগৎ সম্পর্কেজ্ঞাত একজন নারী। তিনি পুরুষের সঙ্গে সমান তালে অভিনয়ের করে গেছেন, সদরের প্রতিনিধি পুরুষের সাথে মিশেছেন। দ্বিতীয়ত, বিনোদিনী ছিলেন একজন অসহায় দরিদ্র নারী। অন্ধকার জগতের অংশীদার, সমাজচ্যুত। সমাজপতি পুরুষই তাকে চ্যুত করে। সুতরাং, এই ধরনের নারীর স্বকীয় অভিব্যক্তি কী, বিশেষত অন্য দিক দিয়ে যিনি সমাজে প্রতিষ্ঠিত, তার সঙ্গে কোন চরিত্র কিও ধরনের আচরণ করেছেন, অথবা সামগ্রিকভাবে পুরুষ ও সমাজ সম্পর্কে তথা জগৎ সম্পর্কে তাঁর ধারণা কি - এ কাহিনীকেও আজকে উপেক্ষা করা যায় না। তৃতীয়ত, নাটক মিশ্র শিল্প। নাটক অভিনয় ছাড়া অসম্পূর্ণ। নাটক পড়া ও অভিনয় দুইই হয়। সুতরাং যিনি নাটক লেখেন তাঁর ভাবনা রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যেমন সম্পৃক্ত, তেমনি যাঁরা অভিনয় করেন তাঁরাও লেখক সৃষ্টি চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হতে সচেষ্ট হন এবং লেখকের ভাবনাকে সর্বদা স্মরণে রেখেই তা করেন। বিনোদিনীর জীবন ছিল রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাঁর কথা থেকে জানা যায় রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা। নাটকের ইতিহাস এই অভিজ্ঞতার কথা ছাড়া অসম্পূর্ণ। বিশেষত স্থায়ী মঞ্চ গড়ে ওঠার পর অভিনয় বিষয়টি কেমন ভাবে বিনোদিনীর মতো অভিনেত্রীর সযত্ন প্রয়াসে শিল্প হিসেবে ক্রমাগত সৃজ্যমান হয়ে উঠেছিল তাও উপলব্ধি করা যায় তাঁর নিজের কথা থেকে। তাছাড়া আমরা ধরে নিতে পারি গিরিশচন্দ্রের উপদেশ 'সত্য যদি অপ্রিয় ও কটু হয়, তাহা সকল সময়ে প্রকাশ করা উচিত নয়' - শিরোধার্য করে তিনি লেখনী সংযত করেছিলেন, তবুও তাঁর রচনা থেকে রঙ্গমঞ্চের রাজনীতি সম্পর্কে ও অবহিত হওয়া যায়।

বিনোদিনী সম্ভবত ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এগারো - বারো বছর বয়সে অর্থাৎ ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে বিনোদিনীর অভিনেত্রী জীবন শুরু হয়। তখন থেকে ১৮৮৬ খ্রিসটাব্দ পর্যন্ত তিই একের পর এক নাটকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধান নারী চরিত্রে অভিনয়ের দ্বারা দর্শক - শ্রোতাদের মন জয় করেছিলেন। বিনোদিনী 'আমার কথা'-য় মূলত এই সময়টিকেই অবলম্বন করেছেন। এই গ্রন্থটির আঙ্গিক কিছুটা অভিনব। তিনি 'মহাশয়' সম্বোধনে পত্রের মাধ্যমে আত্মোন্মোচনে প্রয়াসী হয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে নিজের কথা বলার যে অসুবিধা থাকে পত্রের আবরণে তিনি তা অতিক্রম করতে চেয়েছেন। এ সম্পর্কে হয়তো তাঁর শিক্ষক গোরিশচন্দ্রও তাঁকে সচেতন করে দিতে পারেন। তাই দেখি, বিনোদিনী লিখিত গ্রন্থের যে ভূমিকা তিনি লিখেছিলেন, যা বিনোদিনীর মনের মতো হয়নি বলে প্রথম সংস্করণে সংযুক্ত করেননি, পরবর্তি সংস্করণে করেছিলেন সেই ভূমিকায় এ বিষয়ে তাঁর স্বকীয় অভিমত পাওয়া যায় -

> "পৃথিবীতে যত প্রকার কঠিন কার্য্য আছে তন্মধ্যে আপনার কথা আপনি বলিতে যাওয়া কঠিন কার্য্য। অনেক সময় প্রকৃত দীনতাও ভাণ বলিয়া পরিগৃহীত হয়, স্বরূপ বর্ণনায় অতিরঞ্জিত জ্ঞান হয় ; আর সমস্তটাই আত্মম্ভরিতার পরিচয় - এইরূপ পাঠকের মনে ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা।"

এই গ্রন্থে বিনোদিনী বারে বারে নিজের অবস্থানের কথা বলেছেন। যখন ১৩১৯ বঙ্গাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, তখন তাঁর বয়স ঊনপঞ্চাশ বছর। তিনি অভিনয় থেকে অবসর নেওয়ার ২৬ বছর পর একমাত্র কণ্যা ও আশ্রয়দাতাকে হারিয়ে নিতান্ত অসহায় ও নির্বান্ধব - নিঃসঙ্গ বিনোদিনী তাঁর অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থেকেই নিজের কথা লিখেছেন। সেকালের সব বড় পত্রিকা তাঁর অভিনয় দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিল। কিন্তু তাঁর পরবর্তি জীবন কেমনভাবে কেটেছিল, সতীর্থ অভিনেতাগণই বা তাঁর সঙ্গে তখন কেমন ব্যবহার করেছিলেন - সে সব বিষয় কোথাও জানা যায় না। সবই তাঁর গ্রন্থে লিখীত। গ্রন্থের শুরুতে যেমন রয়েছে দুঃখ দারিদ্রের কথা, শেষ ও হয় যন্ত্রণাকাতর নিঃসঙ্গতা উপলব্ধি করার মধ্যে দিয়ে -

> "এখন একটু একটু করিয়া মৃত্যুর যাতনাটি বুকে করিয়া চিতাভস্মের হায় হায় ধ্বনি শুনিতেছি।"

সমাজবিচ্যুত নারীর সন্তান হয়ে এবং সংসারে প্রান্ত্যেবাসী হয়ে বিনোদিনী উনিশ শতকের নব্যশিক্ষিত সমাজে অভিনয়ের জন্য বৃত হন। বিনোদিনীর অভিনয় শিক্ষার দিকটি এ গ্রন্থ থেকে যেমন জানা যায় তেমনই জানা যায় তাঁর শিক্ষার্থীসুলভ সজীব ও প্রাণবন্ত অন্তরটিকে । তাঁর মায়ের কষ্টের কথা মনে করেই তিনি উপার্জন করতে চেয়েছিলেন -

> " ভাবিতাম যে মায়ের এই দুঃখের সময় যদি কিছু উপার্জ্জন করিতে পারি, তবে সাংসারিক কষ্টও লাঘব হইবে।"

টিপ্পনী

টিপ্পনী

আবার প্রসিদ্ধ অভিনেত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি গভীর ভাবে লক্ষ্য করতেন তাঁদের। 'আমার কথা' - য় তিনি বলেছেন -

> "মনে ভাবিতাম, যে আমি কেমন করিয়া শীঘ্র শীঘ্র এই সকল বড় বড় আভিনেত্রীদের মত কার্য্য শিখিব ! আমার মন সকল সময়েই সেই সকল সময়েই সেই সকল বড় বড় অভিনেত্রীদের কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইত।"

তাঁর লেখা থেকে বোঝা যায়, অভিনয় সত্তা তাঁর জন্মগত। শিল্প ভাবনা তাঁর সমস্ত অস্তিত্বের সঙ্গেই যেন মিশে আছে। তিনি লেখেন তাই -

> "আমি যখন বাড়ীতে খেলা করিতাম তখনও যেন একটা অব্যক্ত শক্তি দ্বারা সেই দিকেই আচ্ছন্ন থাকিতাম। বাড়ীতে থাকিতে মন সরিত না, কখন আবার গাড়ি আসিবে, কখন আমায় লইয়া যাইবে, তেমনি করিয়া নূতন নূতন সকল শিখিব, এই সকল সদাই মনে হইত।"

এই জন্যই বোধহয় তিনি প্রতিটি চরিত্র খুবই সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। শুধুই নয় হঠাৎই কারো চরিত্রে অভিনয় করার অসাধারণ ক্ষমতাও তাঁর ছিল। এরই সঙ্গে তাঁর রূপসজ্জার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। সে কথাও উঠে এসেছে তাঁর গ্রন্থে। তিনি তাঁর শিক্ষকদের কথা স্মরণ করেছেন কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর লেখায়। অভিনয় শিল্পকে আয়ত্ত করার জন্য যে কতটা শিক্ষিত ও দীক্ষিত হওয়া প্রয়োজন তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন -

> "অভিনয় কার্য্য যে হৃদয়ের সহিত মিশাইয়া লইয়া সে কার্য্য মন ও হৃদয় এক করিয়া লইতে হয়; তাহাতে কতকটা আপনাকে টানিয়া মিলাইয়া লইতে হয় তাহা বুঝিতে সক্ষম হইলাম এবং আমার ন্যায় ক্ষুদ্র-বুদ্ধি চরিত্রহীনা স্ত্রীলোকদের যে কতদূর উচ্চ কার্য্য সমাধার জন্য প্রস্তুত হইতে হয় তাহাও বুঝিতে সক্ষম হইলাম।"

সাধনা, সংযম ও কৃচ্ছ্রতার ত্রিবেণী বন্ধনকে উপজীব্য করেই যে শিল্পীর জীবন রচিত তাও বোঝা যায় বিনোদিনীর স্বকীয় জবানবন্দী থেকে -

> "তবুও সাধ্যমত আত্মদমন করিতাম। বুদ্ধির দোষে ও অদৃষ্টের ফেরে আত্মরক্ষা না করিলেও কখনও অভিনয় কার্য্যে অমনযোগী হই নাই। অমনোযোগী হইবার ক্ষমতাও ছিল না। অভিনয়ই আমার জীবনের

সার সম্পর্ক ছিল।"

অভিনয়ের সময় তিনি এমন ভাবে চরিত্রের মধ্যে ডুবে যেতেন যে আত্মসত্তা যেন তাঁর বিলুপ্ত হয়ে যেত। শুধু কি অভিনয় কালে, প্রকারান্তরে নিজ জীবনেই তিনি কি তা বিস্মৃত হননি। তাই দেখা যায়, স্টার থিয়েটারের মতো নতুন রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিতেও পিছপা হননি তিনি। এই রঙ্গমঞ্চ তৈরীর জন্য তিনি অর্থের প্রলোভনকে জয় করেছেন, নির্দ্বিধায় শারীরিক শ্রম করেছেন, এমনকি ব্যক্তিগত জীবনে প্রেমকেও বিসর্জন দিয়েছেন। অথচ নির্মাণের পর অনেকেই দেওয়া কথা রেখেননি, তার যথার্থ মূল্যও তাঁকে দেওয়া হয়নি। একদিকে আত্মদ্বন্দ্ব, অভিমান এবং দুঃখের প্রসঙ্গে সমাকীর্ণ বিনোদিণীর লেখনী, অন্যদিকে তাঁর স্বীকারোক্তি সরল ও অকপট - এই দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্যই তাঁর আত্মজীবনীকে গভীরতা দিয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে বিনোদিনীর এক জীবনেই বহু জন্মান্তর ঘটে গেছে। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে কিম্বা অভিনয় ক্ষেত্রে বহুবার প্রতারিত হয়েছেন। বারে বারে রিক্ত নিঃস্ব রক্তাক্ত হয়েছেন। আবার নিজেকে বুঝিয়েছেন কিন্তু আর কত; কতবার সহ্য করা যায়, তাই বোধহয় তিনি রঙ্গমঞ্চকে বিদায় জানালেন ভীষণ দুঃখে। তাঁর মতো শিল্পীর এ অভিমানকে সকলে মূল্য দিতে পারে নি। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন ('বিল্লমঙ্গল' নাটকে চিন্তামণির ভূমিকায় অভিনয়ের পর) -

> "বিনোদিনীর কোন কোন বিষয়ে অভিমানে গিরিশচন্দ্রকেও উত্ত্যক্ত হইতে হইল। তারপরে চিন্তার ভূমিকায় তাহার অভিনয় খুব ভাবসম্মত এবং প্রকৃষ্ট হইলেও, সঙ্গীত এবং অভিনয়ে গঙ্গারই প্রশংসা হইল বেশী। বিনোদিনীর ক্ষোভ এবং অভিমান বাড়িল। সে মনে করিল গিরিশচন্দ্র ইচ্ছা করিয়াই তাহার ভূমিকার রূপ এইভাবে দিয়েছেন। অভিমানে বিনোদিনী থিয়েটার ছাড়িয়া দিল। এসময়ে তাহার অভিভাবক জনৈক 'রাজা' উপাধিধারী ধনশালী ব্যক্তিরও ইচ্ছা ছিল না যে বিনোদিনী থিয়েটারে অভিনয় করে। গিরিশচন্দ্র পূর্বেই বিনোদিনীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ভিতরে ভিতরে কিরণমালা নাম্নী অভিনেত্রীকে তাহার পার্টগুলি তৈয়ার করাইয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং বিনোদিনীর অভাব রঙ্গমঞ্চের পক্ষে অপূর্ণ থাকিলেও, ষ্টার থিয়েটার চালাইবার পক্ষে কর্তৃপক্ষের আর অসুবিধা হইল না।"

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বোঝাই যাচ্ছে গিরিশচন্দ্র স্টার থিয়েটারের জন্য বিনোদিনীকে আর অপরিহার্য মনে করছেন না। তা না হলে বিনোদিনীর ওপর নিজের জোর খাটাতে পারতেন। যা আগেও তিনি প্রবলভাবেই করেছেন। বিনোদিনীর 'অভিমান' আর শুধু 'গঙ্গার প্রশংসা' বা 'তাহার ভূমিকার রূপ' - এর জন্যই শুধুমাত্র বিনোদিনী মঞ্চ ত্যাগ করেছেন - একথা বিশ্বাসযোগ্য কি ? তাছাড়া কোনো 'ধনশালী ব্যক্তির ইচ্ছা' যে বিনোদিনীর সংকল্পকে টলাতে পারে না, তার প্রমাণ 'আমার কথা'-য় একাধিকবার পাওয়া গেছে। বিনোদিনীর শেষ অভিনয় 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে চিন্তামণির ভূমিকায় নয় তাঁর শেষ অভিনয় 'বেল্লিক বাজার' নাটকে রঙ্গিনীর ভূমিকায়।

লেখক বিনোদিনী তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেকখানি ক্ষমতার পরিচয় রেখেছেন। তিনি গদ্য ও পদ্য সমান দক্ষতায় লিখেছিলেন। অথচ লেখিকা হিসেবে আজও বিনোদিনীর স্থান বাংলা সাহিত্যে গ্রাহ্য হয়নি। আর একটি প্রধান কারণ সম্ভবত, এতদিন পর্যন্ত বিনোদিনীর আত্মকথা তাঁর নিজের রচনা কিনা এ বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ ছিল। সে সন্দেহ নিরসনের সুযোগ সহজেই পাওয়া যেতে পারত। 'ভারতবাসী' পত্রিকার সন্ধান পাওয়া যায় নি, যাতে বিনোদিনীর রঙ্গালয় বিষয়ক পত্রাবলী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল বলে গিরিশচন্দ্র উল্লেখ করেন। তখনো (১৮৮৫) তিনি 'ষ্টার' থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত। এরপর 'সৌরভ' পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল (১৩০২ বঙ্গাব্দ) তারাসুন্দরীর কবিতাও প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকরপে গিরিশচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন -

> "সভ্য সমাজে আমার স্থান আছে কিনা জানি না, জানিতে চাহি না, কারণ যৌবনের প্রথম অবস্থা হইতে, রঙ্গভূমির উন্নতি উদ্দেশ্যে দৃঢ় সংকল্প হইয়া আছি; সে যাহা হউক, অভিনেতৃবর্গ আমার চক্ষে, আমার পুত্র-কণ্যার মত সন্দেহ নাই। তাহাদের গুণগ্রাম অপ্রকাশিত থাকে, আমার ইচ্ছা নয়। সেই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কবিতা দুইটি, পত্রিকায় প্রকাশ করিলাম।"

যাইহোক এরপর বিনোদিনীর দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'বাসনা' ও 'কণক ও নলিনী'। বিনোদিনীর সাহিত্যজীবন প্রায় চল্লিশ বছরের। যদিও তাঁর রচনা সামান্যই এই দীর্ঘকালে। ৬১ - ৬২ বছর বয়সে বিনোদিনী শেষবারের মতো 'রূপ ও রঙ্গ' পত্রিকায় আত্মস্মৃতি লিখেছেন। তা অসম্পূর্ণ। কিন্তু তাঁর রচনাশৈলীর পরিণতি দেখা যায় তাতে। লেখক বিনোদিণী অবহেলিত। তবে এখন বেশখানিক চর্চা হচ্ছে তাকে নিয়ে। 'সাহিত্য

ও সংস্কৃতি' ত্রৈমাসিক পত্রিকার দুটি সংখ্যায় প্রকাশিত (কার্তিক - পৌষ ও মাঘ - চৈত্র ১৩৭৪) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রঙ্গনটী বিনোদিনী দাসী নামে দীর্ঘ ও সুলিখিত আলোচনাটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ মূল্যবান। গিরিশচন্দ্র ও বিণোদিনীর ক্ষুদ্র জীবনীটিতে 'রচণাচাতুর্য ও ভাবমাধুর্য্যের পরিচয়' স্বীকার করেছেন। বাংলা সাহিত্যে অজস্র আত্মজীবনী আছে, গদ্য লেখিকাও অনেক। কিন্তু আন্তরিকতা, সরলতা ও ভাবুকতার এমন সমন্বয় সহজে পাওয়া যায় না। মহিলা আত্মজীবনীকারদের মধ্যে একমাত্র রামসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন'ই এর সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। কিন্তু বিনোদিনীর মতো বৈচিত্রময় অভিজ্ঞতার অধিকারিনী তিনি ছিলেন না। রামসুন্দরী কুলবধূ, আর বিনোদিনী রঙ্গনটী। ব্যক্তিজীবনে বহু রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল। থিয়েটারে অভিনেত্রীর জীবনে সুখদুঃখের ঢেউ সর্বদাই উতরোল। বিনোদিনীর অত্যাশ্চর্য বর্ণনাশক্তিতে সেসব প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর গল্পবলার ক্ষমতাও অসামাণ্য ছিল। আবার তাঁর পত্রাকারে আত্মস্মৃতি নিবেদনের কৌশল বিস্মিত করে পাঠককে। বিনোদিনীর কবিহৃদয়ের পরিচয় শুধু দুটো কাব্যগ্রন্থে নয়, তাঁর গদ্য রচণাতে ছাপ ফেলেছে। তাঁর অনেক বিবরণই যে কবিতা গিরিশচন্দ্রও তা লক্ষ্য করেছিলেন। সবমিলিয়ে 'আমার কথা' একেবারেই অকৃত্রিম, বিশুদ্ধ বেদনা ও উল্লাসের অনবচ্ছিন্ন প্রবাহ। একটি চমৎকার সৃষ্টি। ইতিহাস নয়। দলিল নয় তা মর্মবেদনার কথা যা পঠককে আর্দ্র করে। ভাবায়।

প্রশ্নমালা :

১. নটী বিনোদিনীর 'আমার কথা' কি জাতীয় গ্রন্থ?

২. নটী বিনোদিনীর অভিনয় জীবনের কথা কিভবে উঠে এসেছে তাঁর আত্মজীবনিতে?

৩. বিনোদিনীর ব্যাক্তিজীবন ও মঞ্চজীবন - দুইই বঞ্চনার ইতিহাসে পূর্ণ - আলোচনা করো।

৪. 'আমার কথা'-য় লেখিকা বিনোদিনীর চমৎকার প্রকাশ - আলোচনা করো।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

একক - ২ :: নির্বাচিত কবিতা

শোকগাথা : রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী

টিপ্পনী

ত্রিপুরার প্রথম মহিলা কবি। কবি অনঙ্গমোহিনী দেবী। রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী। ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ কন্যা। কিশোরী বয়স থেকেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। পিতার উৎসাহে তা আরো বাড়ে। ক্রমে তাঁর কবিত্বশক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে। খুব দীর্ঘ জীবন তাঁর ছিল না। ১৮৬৪ সালে (২০ / ০২/ ১৮৬৪) তাঁর জন্ম এবং মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে অর্থাৎ ১৯১৮ সালে (১৩/০৫/১৯১৮) তাঁর মৃত্যু হয়। এই স্বল্পায়ু জীবতে তিনি তিনটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ হল 'কণিকা' (১৮৯৯), দ্বিতীয়টি 'শোকগাথা' (১৯০৬) এবং তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ হোল 'প্রীতি' (১৯১০)।

'কণিকা' কাব্যগ্রন্থ রচণার পাঁচ বছর পর বাংলা ১৩১৩ সনে অর্থাৎ ইংরেজি ১৯০৬ সালে তাঁর 'শোকগাথা' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই কাব্যটি লেখিকা রচনা করেন তাঁর স্বামী গোপীকৃষ্ণের প্রয়াণের পর। ফলে এ কাব্যে কবির মনোবেদনার গভীর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। অনঙ্গমোহিনী দেবি এ কাব্য সম্পর্কে নিবেদন অংশে লিখেছেন -

> "নিয়তির নিদারুণ নিয়মাধীনে যে মহাপ্রলয় আমার জীবনে ঘটিয়াছে, তাহারই করুণ উচ্ছ্বাস সময়ে সময়ে কবিতার আকারে প্রকাশ হইয়াছে। ..... শোকগাথা আমার জীবনের ঘোর বিষদাময় ঘটনার ও দীর্ণ হৃদয়ের নিদর্শন মাত্র। সুতরাং ইহাতে কাহারও মনোরঞ্জন হইবে বলিয়া আশা করি না।"

তাঁর কবিত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে সাহিত্যিক বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'শোকগাথা'র ভূমিকায় বলেছেন -

> "এই কবিতাগ্রন্থের প্রত্যেক কবিতায় রচয়িত্রীর কবিত্ব-শক্তির সবিশেষ পরিচয় পাইবেন। এই কবিতাগুলি, রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী, তাঁর স্বর্গবাসী স্বামীর চরণে উৎসর্গ করিয়াছেন; এবং তাঁহারই স্মৃতিতে গ্রন্থের সকলগুলি কবিতা রচিত।"

টিপ্পনী

তিনি আরো বলেছেন -

> "শোকগাথা মর্মাহত হৃদয়ের শোকপূর্ণ ইতিহাস, মনের গভীর বেদনা স্বতঃউৎসারিত শব্দের আড়ম্বর নাই, ভাব ও ছন্দের বৈচিত্র্য নাই, আছে শুধু সরল প্রাণস্পর্শী বেদনার বিকাশ।"

পাশাপাশি তিনি একথা বলেছেন যে -

> "ত্রিপুরার রাজপরিবারে সরস্বতীর বিশেষ কৃপা। সঙ্গীতে চিত্রে, কাব্যে রাজপরিবারের সুখাতি বঙ্গদেশেব্যাপী । রাজপরিবারের মহিলাগণও যে, উহাতে অণুরাগিণী এবং কবিত্ব প্রতিভায় দীপ্তিমতী রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবীর কবিতায় তাহা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।"

আমরা প্রথমেই তাঁর 'বিদায়' কবিরতাটির দিকে আলোকপাত করবো। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রিয়তম স্বামীর প্রয়াণে গভীর মনোবেদনায় 'শোকগাথা' রচিত। 'বিদায়' কবিতাতে তার স্পষ্ট প্রকাশ রয়েছে। প্রিয় বিচ্ছেদের স্মৃতি তাঁকে ভারাক্রান্ত করেছে। সেই দুঃখ ধেকে উৎসারিত কবিতা 'বিদায়'। সেই দুঃখ স্মৃতির কথাই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এখানে। এ কবিতায় তিনি সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কোথাও পাননি। তাই স্বামীর স্মৃতিটুকুই তাঁর একমাত্র সম্বল হয়ে উঠেছে। প্রকট হয়েছে বিদায়ের বেদনা।

প্রিয়তম স্বামী চিরতরে চলে গিয়ে অতল, অনন্তে ডুবে গেছে কবির জীবন। সমস্ত সুখ, সাধ-আহ্লাদ, সুখের বাসনা - আর কিছুই অবশিষ্ট নেই জীবনে। শুধু পড়ে আছে অনন্ত, সীমাহীন বেদনা আর ক্রন্দন। কবির গভীর বেদনার্তির প্রকাশ তাই ঘটেছে এভাবে কবিতায় -

> "চিরতরে চলে গেছে হৃদয়ের রাজ,
> অতল বিষাদে মোরে ডুবাইয়ে আজ !
> নিয়ে গেছে সুখ সাধ সুখের বাসনা,
> রেখে গেছে জন্মশোধ হৃদয় বেদনা !"

স্বামী যতদিন ছিল, ততদিন ছিল তাঁর জীবনের বসন্ত। স্বামীর মৃত্যুতে সে বসন্ত চিরকালের জন্য নির্বাপিত, নির্বাসিত। সমগ্র জীবন তাঁর ঘনঅন্ধকারে পূর্ণ হয়ে গেছে। সুখের সে দিনগুলি হঠাৎই বিস্বাদময় বিষাদে পূর্ণ হল। রাত্রির সুধামাখা চন্দ্রিমা কোথায়

হারিয়ে গেল, রোদ ঝলমল দিনের সুখ স্মৃতিমাত্র হল, সকালবেলার স্নিগ্ধ বাতাস, সন্ধ্যার রক্তরাগ সবই অনুভূতিহীন, বর্ণহীন, ফ্যাকাসে। প্রস্ফূতিত ফুলের বাগানের সুবাস, সৌন্দর্য, ভ্রমরের গুঞ্জন সবই চলে গেল প্রিয়তমের সাথে সাথে মৃত্যুর পথে। এখন শুধুই বিলাপ, হতাশ্বাস, অন্ধকার ঘনায়মান -

সে মম পুষ্পিত শুভ্র বসন্ত জীবন.
গেছে যবে, সাথে গেছে আমার ভুবন !
নিশীথের সুখময় জোছনা মগন,
মধ্যাহ্নের আলোময় উজ্জ্বল গগন ;
প্রভাতের মৃদুমন্দ মলয় বাতাস,
ধূসর রক্তিম চারু সন্ধ্যার আকাশ;
কুসুমিত সুবাসিত নিকুঞ্জ কানন,
ভ্রমর গুঞ্জিত সদা সুখের সদন !
এ সকলি গেছে চলে তারি সাথে সাথে
এবে নিশা দেখা দেয় জীবন - প্রভাতে !"

এ কোন সকাল এল কবির জীবনে যা রাতের চেয়েও অন্ধকার। কোথাও কোন আশা আর বেঁচে নেই, কোন প্রেরণা নেই। কোন সান্ত্বনা নেই। সব ধূসর। এ সময়ে তাই উচ্চারিত হয় -

"গিয়েছে সকলি মম কিছু নাহি আর ;
রয়েছে কেবল স্মৃতি আর অশ্রুধার !"

'স্মৃতি' কবিতাটি পাঠ করলেও পাঠক হৃদয় বিদীর্ণ হয় দুঃখে। কবির পাঠকও শোক সাগরে নিমগ্ন হন। মৃত্যুকালীন সেই স্মৃতি কবি যে ভাবে কাব্যে ধরে রেখেছেন তা ভীষণই এক মর্মঘাতী চিত্র। এ স্মৃতি পাঠ করা খুবই শক্ত। হৃদয় - বিদারক সে স্মৃতি তিনি সৃজনশীল স্মৃতিতে পরিণত করেছেন -

"জন্মশোধ বিদায়ের বিষাদ - চুম্বন,
যাতনায় ক্লিষ্ট সেই বিবর্ণ বদন !
আকুল বিষাদ ভরে হাতে হাত রাখি

টিপ্পনী

টিপ্পনী

চেয়েছিল, অশ্রুপূর্ণ প্রভাহীন আঁখি !
এ বিষাদ - ছবি জাগে হৃদি - দরপণে
এ করুণ-গীতিভাসে মৃদু গুঞ্জরণে
অশান্ত জীবনে মম, প্রভাতে সন্ধ্যায়
শুধু সেই স্মৃতি রেখা হৃদয়েতে হায় !
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে করিয়ে পোষণ,
রাখিয়াছি সেই স্মৃতি করি সযতন।"

আবার বর্ষার ব্যাথিত মলিন দৃশ্য কবিকে শোকাতুর করে তুলেছে। এত দুঃখ, নিরাশা কবিকে গ্রাস করে ফেলেছিল ক্রমশ যে তিনি সে জ্বালা জুড়ানোর জন্য প্রকৃতির কোলে নিজেকে মেলে দিতে চান। তার সমস্ত মর্মজ্বালা যদি এতে কিছুটা হলেও প্রশমিত হয় সেই আশায়। তিনি তাই ঊষার কোলে মিশে যেতে চান, মেঘের মেদুর বাতাসের সঙ্গে সুদূর আকাছে ভেসে যেতে চান। কিম্বা সাগরতীরে বসে তরঙ্গ মালা দেখতে চান, সেখানে বাতাসকে সব দুঃখ বলে মনোবেদনাকে লঘু করতে চান। কাব্যে তাই তিনি লিখেছেন -

"আজিকে নিবিড় মেঘের আঁধারে
ঊষার মলিন আলোকে ভায় ;
নিরাশা-হুতাশ ঘেরিছে আমারে
ম্লান মুখে আশা চলিয়া যায় !
ডুবে যায় চাঁদ পশ্চিম গগণে
নিবু নিবু আলো মিশিয়া যায় ;
সরসীর নীল সলিল শয়নে
মুরছি কুমুদী পড়িছে হায় !
.....
আজিকে কেবলি সাধ হয় মনে
ঊষার কোলেতে মিশিয়া যাই,

মেঘের মেদুর বাতাসের সনে
সুদূর আকাশে ভাসিয়া যাই।
অথবা আকূল - সাগরের তীরে
বসিয়া দেখিব তরঙ্গ মালা ;
সজনী গো শুধু কহিব সমীরে
আমার অসহ মরম জ্বালা।"

'শোকগাথ'-র সমস্ত কবিতা কবি এরকম বেদনাভারাতুর মন নিয়ে লিখেছেন। স্বামীর স্মৃতিতে।

প্রণয়ে ব্যথা : কামিনী রায়

বাংলা কাব্য সাহিত্যের অন্যতম কবি কামিনী রায়, ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দেদর ১২ ই অক্টোবর বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাসন্ডা গ্রামে এক মধ্যবিত্ত বৈদ্য পরিবারে জন্ম। তাঁর পিতা স্বনামধণ্য গ্রন্থেকার চন্ডীচরণ সেন। 'টম কাকার কুটীর' এর অনুবাদক। কামিনী রায়ের প্রাথমিক পাঠ মায়ের জকাছে শুরু হয়। কামিনীর জন্মের আগেই তাঁর মা একেবারে নিজস্ব চেষ্টায় লোখা - পড়া শেখেন। রান্নাঘরের হেঁসেল বা হাঁড়িশালটি কাঁচা মাটির দেয়াল ঘেরা ছিল, তারই গায়ে কাঠের টুকরো দিয়ে কামিনীর মা অক্ষর লিখে লিখে অভ্যাস ককরতেন। আবার রান্নার শেষে তা লেপে ঢেকে দিতেন। কেননা স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে তখন ভ্রান্ত ধারনা ছিল। এবং মধ্যবিত্ত পরিবারে লেখাপড়ার চর্চাকে কেউ প্রশ্রয় দিতেন না। কামিনীর জন্মের আগে পিতা চন্ডীচরণ সেন, তার স্ত্রীকে একটি চিঠি লেখেন। তাতে সন্তানের প্রতি মায়ের কর্তব্য, মাতৃত্বের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ক কিছু উপদেশ ছিল। সেই চিঠি নিয়ে বাড়িতে খুব হুলস্থূল পড়ে গিয়েছিল। এমনি ছিল সে সময়। যাইহোক মায়ের কাছেই কামিনীর বর্ণপরিচয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের পাঠ শেষ হয়। তারপর স্কুল জীবন। সেখানে কামিনী মেধার পরিচয় রাখলেন। উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হলেন। বাবার কাছে গণিতে পাঠ তিনি এমন সুন্দর ভাবে নিয়েছিলেন যে, গণিতে তার সমকক্ষ কেউ ছিল না, সেসময়। তাঁর গণিত শিক্ষক বাবু শ্যামাচরণ বসু তাঁকে গণিতের পারদর্শিতার জন্য লীলাবতী আখ্যা দেন। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি মাইনর পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

ষোল বছর বয়সে কামিনী প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর

টিপ্পনী

F.A. পরীক্ষা দেন এবং সংস্কৃত ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতিয় স্থান লাভ করেন। দু'বছর পর B.A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় তিনি সংস্কৃত ভাষায় দ্বিতীয় শ্রেনীর অনার পান। তারপর ১৮৮৬ সালে কামিনী বেথুন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হ'ন। তাঁর রচিত 'আলো ও ছায়া' প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ সালে। যদিও এর বেশির ভাগ কবিতা প্রকাশের অনেক বছর আগে রচিত।

টিপ্পনী

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে স্ট্যাটুটরী সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সঙ্গে কামিনীর বিয়ে হয়। কামিনী সেন হন কামিনী রায়। এ সময় কামিনী রায়ের 'গুঞ্জন' প্রকাশিত হয়। সংসার-সন্তান, স্বামী সেবায়ও কামিনী রায় খুবই মনযোগী ছিলেন। তাঁর নিজের কথায় - 'বিবাহিত জীবনের কর্তব্যগুলিই আমার জীবন্ত কবিতা'। কিন্তু সংসার সুখ বেশিদিন তাঁর কপালে ছিল না। ১৯০০ সালে তাঁর এক সন্তানের মৃত্যু হয়। ১৯০৮ সালে ঘোড়ার গাড়ি উল্টে গিয়ে স্বামীর মৃত্যু ঘটে। এরপর ১৯২০ সালে কণ্যা লীলা ও পুত্র অশোকের মৃত্যু ঘটে। এই 'শোকের ঝড়' তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ করে দিয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে প্রকাশ পেল 'অশোক-সঙ্গীত'; পুত্র শোকাতুরা জননী শোকের অপূর্ব অভিব্যক্তি। আবার নতুন করে তিনি লেখালিখির মধ্যে প্রবেশ করেন।

কামিনী রয়ের কাব্য ও অন্যান্য গ্রন্থগুলি হ'ল -

১. আলো ও ছায়া (১৮৮৯)

২. নির্মাল্য (১৮৯১)

৩. পৌরাণিকী (১৮৯৭)

৪. গুঞ্জন (১৯০৫)

৫. ধর্মপুত্র (অনুবাদ গল্প, ১৯০৭)

৬. অশোকস্মৃতি (প্রয়াত পুত্রের জীবনী, ১৯১৩)

৭. শ্রাদ্ধিকী (১৯১৩)

৮. মাল্য ও নির্মাল্য (১৯১৩)

৯. অশোক সঙ্গীত (১৯১৪)

১০. অম্বা (নাট্যকাব্য, ১৯১৫)

১১. সিতিমা (গদ্য নাটিকা, ১৯১৬)

১২. ঠাকুরমার চিঠি (১৯২৪)

১৩. দীপ ও ধূপ (১৯২৯)

১৪. জীবনপথে (১৯৩০)

আমাদের আলোচ্য 'প্রণয়ে ব্যথা' কবিতাটি 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। এই কাব্যগ্রন্থে যে ক'টি প্রণয় - কবিতা আছে, তার প্রতিটির মধ্যে একটা বেদনার সুর দেখা যায়। প্রত্যেক মহিলা কবির কবিতার মধ্যেই এই সুর লক্ষ্য করা যায়। 'প্রণয়ে ব্যথা' কবিতাতেও তা বিদ্যমান। এর কারণানুসন্ধান করার আগে আমরা কবির লেখা 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল' প্রবন্ধের কিছুটা অংশের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারি -

> "পুরুষের প্রভুত্ব প্রিয়তাই স্ত্রীলোকের জ্ঞানার্জ্জনের একমাত্র অন্তরায় না হইলেও মুখ্য অন্তরায়। আমরা দেখিতে পাই অনুশীলনের অভাবে শিক্ষা অনেক সময় ব্যার্থ হইয়া যায়। স্ত্রীজাতি জননী জাতি বলিয়া অধীত বিষয়ের অনুশীলনে তাহার অবসর পুরুষ হইতে অনেক কম। পত্নীত্ব ও জননীত্ব নারীর কর্তব্যক্ষেত্রে যেমন সীমাবদ্ধ করিয়াছে, শিক্ষাকালও অদ্রুপ অল্প পরিসর করিয়াছে। নারী কি সে জন্য অসুখী? বর্তমানে এক কথায় ইহার উত্তরসম্ভবে না। জগতের সংখ্যাতীত রমণী এবং বহুল পুরুষ জ্ঞানলাভে নিরুৎসুক, এমন কি একান্ত বিমুখ। কিন্তু পুরুষ সাধারণের জন্য শিক্ষার যেরুপ ব্যবসা, নারী সাধারণের জন্য তদ্রুপ ব্যবসা নাই। সংসারে প্রবেশ করিয়া সকল পুরুষ জ্ঞানার্জ্জনে ব্যাস্ত থাকে না। আপনাপন ব্যবসা ও চাকরী লইয়াই অধিকাংশ সময় কাটায়। নারী আপনার গৃহকর্ম ও গৃহধর্ম্মে ব্যাস্ত থাকিবে বলিয়া পূর্ব হইতেই তাহার শিক্ষার পথ রুদ্ধ। যে জন্মান্ধ সে আলোকের জন্য কাঁদে না। কিন্তু যে একবার আলোক দেখিয়া দর্শন সুখে বঞ্চিত আছে সে নিতান্তই দুঃখী। এরূপ দুঃখিনী নারীর সংখ্যা নিতান্ত বিরল নহে।"

এই উদ্ধৃতির বক্তব্য বিষয় যদিও সরাসরি 'প্রণয়ে ব্যথা' কবিতার সঙ্গে সংযুক্ত নয়, তবুও এ কথা থেকে প্রমাণিত কামিনী রায়ের আত্মসচেতন অবস্থানটি। 'প্রণয়ে ব্যথা' কবিতাটি যদিও ব্যক্তিগত অনুভূতিকেন্দ্রিক তবুও এই কবিতার কিছু কিছু অংশ কামিনী রায়ের উপরের বক্তব্যকে সমর্থন দেয়। তাঁর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে তিনি শুধু সচেতনই ছিলেন না, তিনি পুরুষতান্ত্রিকতার নেতিবাচক প্রভাবকে সমালোচনা

টিপ্পনী

করেছেন, নারীর সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে।

'প্রণয়ে ব্যথা' কবিতাটি মূলত তাঁর ব্যক্তিজীবনের দুঃখ, ব্যথা, বিয়োগ সংক্রান্ত অভিঘাতের ফল। পুত্র কন্যা, স্বামীর মৃত্যু তাঁকে বিহ্বল, অসহায় করে তোলে। স্বামীর মৃত্যুর যন্ত্রণা এ কবিতায় বেশি প্রতিফলিত। কোন কোন জায়গায় তিনি তাই অদৃষ্টকে দোষারোপ করেছেন; খানিকটা দুঃখ ভোলার জন্য। কিন্তু এ দুঃখ কি ভোলা যায় ? কোথাও কি সান্ত্বনা মেলে ? তাই কবিতার শুরুতে তিনি প্রশ্নের সুরে আসলে দারুণ যন্ত্রণাকেই ব্যক্ত করেন -

"কেন যন্ত্রণার কথা, কেন নিরাশার ব্যথা
জড়িত রহিল ভবে ভালোবাসা সাথে ?"

ভালোবাসার কেন এত যন্ত্রণা ? কেন এত হাহাকার ? প্রণয়ের পথ কেন এত কষ্টময় ? তাই দুঃখে কবির অন্তরাত্মা কাঁদে। ঝরে অবিরাম 'অশ্রুধার'।

এই বিপুল পৃথিবীতে যদি বা একজন মনের মত সাথী মেলে, তবু কেন নিয়তি, অদৃষ্ট সেই দুটি প্রাণকে একসাথে চলতে দেয় না। কেন 'অনুলঙ্ঘ্য' বাধার রাশি দুটি জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় ? চিরতরে দুটি জীবনের বিচ্ছেদ ঘটে। মৃত্যু এসে সে প্রণয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কেন এমন হয় ? এ দুঃখ কি প্রাণে সয় ? কবি এবার ব্যক্তি অনুভূতি থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে নারী-পুরুষের বৈষম্য নিয়ে বলতে শুরু করেন। একজন নারী সে সময়ে পুরুষের ওপরই নির্ভরশলী ছিলেন। সে নারী যদি তার সর্বস্ব দিয়ে একজন পুরুষকে আপন করে নেন, তাকে আশ্রয় করে বাঁচেন। নিজেকে যদি নিবেদন করেন একজন পুরুষের পায়ে, তবে কেন সে পুচরুষ নারীর মর্যাদা রক্ষা করবেন না ? কেন তাঁর এই সঁপে দেওয়াকে সম্মান করবেন না ? তৎকালে দাঁড়ীয়ে তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কবির এ ছিল এক তীব্র প্রতিবাদ। যার সুর ধ্বনিত হয়েছে তাঁর 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল' পচরবন্ধচে। এই কবিতায়ও তেমন মানসিকতার তেমন স্বরের শব্দ শোনা যায়। তা মৃদ্যু নয়, দৃঢ় -

"অথবা, একটি প্রাণ, আপনারে করে দান
আপনারে ফেলে দেয় অপরের পায়;
সে না বারেকের তরে ভুলেও ভ্রুক্ষেপ করে,
সবলে চরণতলে দলে চলে যায়।"

টিপ্পনী

পুরুষের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ নেই। কিন্তু পুরুষের অবএলার প্রতি তাঁর কণ্ঠ সোচ্চার। বিশেষত সমাজের অবলা নারীদের প্রতি তাঁর এ দৃপ্ত বলা, তাঁকে আলাদা স্থান দিয়েছে কাব্যের জগতে।

কিন্তু এ দৃপ্ত উচ্চারণের পর তিনি আবার বিষাদগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন তাঁর ব্যক্তিজীবনের দুর্ঘটনার কথা মনে করে। অকালে তাঁর প্রিয়তম স্বামীর মৃত্যু তাঁকে ভীষণ আঘাত দিয়ে যায়। সে কথা বারে বারে তাঁর মনোজগতকে বিদীর্ণ করে চলে। তাই কবিতার শেষে তাঁর বেদনা মিশ্রিত উচ্চারণ, নিজের ভাগ্যের প্রতি, বিধাতার প্রতি, নিয়ন্তার প্রতি -

"নৈরাশপূরিত ভবে, শুভযুগ কবে হবে,
একটি প্রাণের তরে আর একটি প্রাণ
কাঁদিবে না সারা পথে ; প্রণয়ের মনোরথে
স্বর্গে মর্ত্যে কেহ নাহি দিবে বাধা দান ?"

এ তাঁর দুঃখ, আক্ষেপ। যা আর পূরণ হবার নয়। ত্রিপদী ছন্দে রচিত এ এক শোকগাথা, যা ব্যক্তিগত আবেগে, উত্তাপে আদ্র। তবে একান্ত পারিবারিক দুঃখ থেকে এ কবিতা সার্বজনীন হয়ে ওঠে যখন তা সামাজিক সমস্যাকে বলে। তাছাড়াও এ কবিতা রচনার সাবলীলতায়, ভাবের নিরবিচ্ছিন্নতায় সুন্দর হয়ে ওঠে, গান হয়ে ওঠে। 'Our Sweetest songs are those that tell of saddest thought'।

পরমেশ্বরীকে : কবিতা সিংহ

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে যে সব ক্ষণজন্মা সৃজনশীল মানুষ এই বাংলার মাটিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন প্রখ্যাত গল্পকার, ঔপন্যাসিক, কবি এবং সাংবাদিক কবিতা সিংহ (১৯৩১ - ১৯৯৮)। সর্বার্থেই তিনি ছিলেন একজন আধুনিক নারী। বলা যয় তিনি নিজে তাঁর সমসাময়িক লেখক ও সাংবাদিকদের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রগামী ছিলেন। তিনি তাঁর লেখার মধ্যে নতুন সমাজের কথা বলতেন, যে সমাজ বর্তমান সমাজ অপেক্ষা উন্নত, আধুনিক। তিনি বাংলার নারীবাদি রচনার অন্যতম স্রষ্টা। তাঁর হাতেই আধুনিক কবিতায় নারীবাদের সূচনা। তবে তিনি মূলত কবি। তবে অত্যন্ত শক্তিশালী কথাকারও ছিলেন তিনি। একই সঙ্গে তিনি এই উপমহাদেশের অন্যতম পথিকৃৎ নারী সাংবাদিক। খবরের কাগজ, সাময়িকী বা প্রিন্ট

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মিড়িয়াতেই নয়, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া অর্থাৎ তখনকার দিনের বেতার কেন্দ্র আকাশবাণীতেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন। যাইহোক সাহিত্য রচনায় তিনি গদ্যে ও পদ্যে সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নিজের জীবনদৃষ্টির আলোকে তিনি সমাজে নারীর দুরবস্থাকে গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তাই উঠে এসেছে তাঁর লেখায় । জীবন্ত হয়ে। পরবর্তিকালে কবিতা সিংহের উত্তরসূরী হিসেবেই নবনীতা দেবসেন, মন্দাক্রান্তা সেন,মল্লিকা সেনগুপ্ত প্রমুখ নারী লেখকরা তাঁদের সাহিত্য রচনায় সমাজে মেয়েদের বঞ্চনা, অবহেলা, অসহায়তার প্রসঙ্গকে জোর গলায় প্রকাশ করে পেরেছিলেন । নবনীতা দেবসেন একজায়গায় কবিতা সিংহ প্রসঙ্গে স্মৃতি রোমন্থন করেছেন শ্রদ্ধার সঙ্গে এ ভাবে -

> "কফি হাউসের দরজায় দীপশিখার মতো উজ্জ্বল এবং সহজ সুন্দরী কবিতা সিংহকে সেই প্রথম দেখা মুহূর্ত থেকেই যে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখেছিলুম সে চোখ কখনো বদলায়নি । অবাক হয়ে শুনেছিলুম, বিমল রায় চৌধুরির স্ত্রীর নাম কবিতা সিংহ। সেই পঞ্চাশের দশকে এমনটি হতো না। কিন্তু কবিতা সিংহ যে সব দিক থেকেই একমে বা দ্বিতীয়ম, বাংলা সাহিত্যে তাঁর কোনো তুলনা নেই । আজকের নারীবাদিনীদের চেয়ে অনেক ক্রোশ বেশি পথ হাঁটতে হয়েছিল তাঁকে। আর এগিয়ে ছিলেন যোজন যোজন বেশি। জীবন তাঁর সরল ছিল না। না ঘরে, না কর্মক্ষেত্রে। হবে কী করে কবিতাদি যে রণরঙ্গিনী।"

কবিতা সিংহের জন্ম ১৯৩১ সালের ১৬ অক্টোবর, কলকাতার ভবানীপুরে। ছয়-সাত বছর বয়স থেকেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। এক্ষেত্রে মা ছিলেন তাঁর প্রেরণা। ১৯৪৬ সালে পনেরো বছর বয়সে নেশন পত্রিকায় প্রথম তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। সেটি সম্ভবত ইংরেজি কবিতা। মায়ের উৎসাহের পাশাপাশি বিবাহিত জীবনে স্বামী বিমল রায় চৌধুরীরও উৎসাহও তাঁকে কবিতা লিখতে সাহায্য করেছিল। বিবাহিত জীবনে তাঁকে খুব লড়াই সংগ্রাম করতে হয়েছে। বাড়ির অমতে বিয়ে করায় তাঁকে টিউশনি, শিক্ষকতা, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতা, বিজ্ঞাপনের কপি লেখা - সবই করতে হয়েছে। লড়তে লড়তে এগিয়েছেন তিনি। এই জীবনাভিজ্ঞতাই উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়। তাঁর জীবনের কুড়ি থেকে তিরিশ বছর সময় পর্বে তিনি লিখেছেন অসংখ্য কবিতা। এসময়েই গল্প উপন্যাস লিখতে শুরু করেন তিনি। ১৯৬৫ সালে আকাশবাণী

কলকাতা কেন্দ্রে বাংলা কথিকা বিভাগের সহকারী প্রযোজিকা হিসেবে তিনি যোগ দেন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত তিনি বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন আকাশবানীর সঙ্গে। আকাশবানী কলকাতা কেন্দ্রের প্রথম মহিলা অধিকর্তা হন কবিতা। রেইও সূত্রেই প্রথম বার বিদেশ যাত্রা তাঁর। বেতারে উচ্চতর কুশলতার জন্য ১৯৭৯ সালে তিনি পূর্ব জার্মানিতে গিয়েছিলেন। ১৯৮১ সালে আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখক ওয়ার্কশপের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। পশ্চিম জার্মানির'ফ্রাঙ্কফুর্ট বুক ফেয়ার' এ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন তিনি। পরে বহুবার আমেরিকায় যান কবিতা। তাঁর ছোট মেয়ে পরমেশ্বরী আমেরিকার বস্টনে থাকেন। ছোট মেয়ের কাছে বস্টনেই ১৯৯৮ এর ১৭ অক্টোবর মৃত্যু হয় কবিতা সিংহের। তাঁর তিন সন্তান। দুই মেয়ে রাজেশ্বরী ও পরমেশ্বরী এবং ছেলে কনাদ রায়চৌধুরী।

টিপ্পনী

পাঁচের দশকের একজন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কবি কবিতা সিংহ। কবিতার পাশাপাশি গল্প-উপন্যাসেও তিনি সমদক্ষ। তবে মূলত কবি হিসেবেই তিনি প্রতিষ্ঠিত বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে। পঞ্চাশ -ষাট - সত্তরের দশকে কবিতা লিখলেও বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়েও তাঁর কবিতা খুব প্রাসঙ্গিক। বাংলার ছোট বড় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় অজস্র কবতি লিখেছেন তিনি। তাঁর সব কাব্যগ্রন্থ বই আকারে প্রকাশ পায় নি। তার কবিতা বই এর সংখ্যা তিনিটি - 'সহজসুন্দরী' (১৯৬৫), 'কবিতা পচরমেশ্বরী' (১৯৭৬) এবং 'হরিণা বৈরী' (১৯৮৩)। ১৯৮৭ তে প্রকাশিত কবিতা সিংহের শ্রেষ্ঠ কবিতা।

আমাদের আলোচ্য কবিতা 'পরমেশ্বরীকে'। কবিতাটি 'কবিতা পরমেশ্বরী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। নিজের সন্তানকে নিয়ে লিখতে গিয়ে তিনি সামগ্রিকতায় পৌঁছেছেন এ কবিতায়। আমারা আগেই উল্লেখ করেছি যে কবির এক কন্যার নাম পরমেশ্বরী। তার কথা এ কবিতার বিষয় হলেও সমগ্র শিশুকণ্যাদের কথাই তাঁর বলার উদ্দেশ্য।

কবি ব্যক্তিজীবনের দেখার অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছেন যে এ সমাজে নারীরা বঞ্চিত। অধিকারহীন। কবির নিজের জীবনের শৈশব কৈশোর তাঁর সন্তান সন্ততিরা যেন না পায়। এ ভাবনা তিনি ভাবেন। তাঁর যৌবনও তিনি সন্তানকে দিতে চান না। আসলে কবির সমকালকে কবি তাঁর সন্তানের মধ্যে দিয়ে দেখতে চান না। যে শৈশব, কৈশোর, যৌবনময় নারীকে মানুষ হিসেবে ভাবে না এ সমাজ, তা তিনি কোন ভাবেই তাঁর পরবর্তী প্রজন্মকে দিতে চান না। বরং তিনি চান নারী নিজেই নিজের অধিকার বুঝে

নিক। ছিনিয়ে নিক তার প্রতিভার স্বীকৃতি। কারো কাছে হাত পেতে দয়ার দান গ্রহণ নয়, নিজেই হয়ে উঠুক নিজের পরিচয়।

নারীকে সংস্কারের দামী আংটি পরিয়ে অধিকার করতে চায় পুরুষ। তা কবি চান না। সে কথা স্পষ্ট করে বলেছেন কবিতায় -

"আমার শৈশব আমি তোমাকে দেব না শিশু
কৈশোর যৌবন, আমি তোমাকে দেব না, ওরা
এখনো আঙুলে আঙটি পরার সাদা দাগ
কীরকম আঙটি ছিল ? কেমন পাথর কোন্ কাজ ?"

নারী সত্তার এহেন অপমান প্রখর চেতনা সম্পন্ন কবি কেমন করে মেনে নেবেন। তাই এই ধারালো অক্ষরগুলি দিয়ে এ প্রতিবাদ।

সকল মা - বাবাই চান তার সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ। নিজেরা যে অতীত অতিক্রম করে এসেছেন তার চাইতে উন্নত ভবিষ্যতকে দিতে চান সন্তানকে। কবিও তাই চেয়েছেন। তবে মা হয়ে মেয়ের জন্য চেয়েছেন। বাবা হয়ে ছেলের জন্য চাওয়ার থেকে তা ভিন্নতর। গভীর অর্থবহ তাই বারে বারে তিনি নিজের অতীতটাকে ঢেকে রেখে, চাপা দিয়ে কন্যার ভালো ভবিষ্যৎ চেয়েছেন। সে চাওয়া অলীক কল্পনা প্রবণ নয়। অনেক বেশি বাস্তবের সত্যকে দিয়ে নির্মিত। সেই জন্য কবি বলেন তোমার ভবিষ্যৎ তোমাকেই তৈরী করতে হবে। তার মধ্যে অনেক লড়াই সংগ্রাম থাকবে। কোন স্বপ্নালুতা দিয়ে সে কাজ হবে না। কন্যা বলে, নারী বলে সে সংগ্রাম আরো বেশি কঠিন। কবি সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন -

"তোমাকে তোমার জামা বুনে নিতে হবে খুব শীতে
তোমাকে তোমার স্বাদ নিতে হবে নিজের জিহ্বায়
তোমাকে তোমার ধাঁচে জগতের বাহিরে জগৎ
জয় করে নিতে হবে নিজের ঘোড়ায়
তোমাকে অসুখ নিয়ে ঘাম নিয়ে মজ্জার ভিতরে
ফুটে ওঠা বীর্যের বকুল নিয়ে ঝরতে হবে নিজের ছায়ায়"

এমন উচ্চারণে কবিতার কবিতা আর কবিতা থাকে না তা জীবনবেদে পরিণত

টিপ্পনী

হয়। এখানেই কবিতাটি সকলের হয়ে ওঠে। সাবলম্বী, স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্মনির্ভরশীল, আত্মমর্যাদাবান হয়ে ওঠার জন্য এ তো রীতিমতো মন্ত্র। কবির দৃঢ় মানসিকতারই পরিচয় ফুটে ওঠে এখানে।

এরপর কবি আরো বাস্তববাদী। আরো নির্দিষ্ট। জীবনে 'সর্টকাট' দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। জীবনকেও চেনা যায় না। হয়তো কবি নিজের জীবনে কিছু সঞ্চয়, কিছু সুখের অধিকারী হয়েছেন কিন্তু তা তিনি উত্তরসূরীকে দিয়ে তার জগতকে চেনার দৃষ্টি বন্ধ করতে চাননা। নিজেই সে যেন নিজের চোখ, মন, মেধা দিয়ে জগতকে চেনে তার জন্য পরিকল্পনা করেন কবি। তাই নিজের সুখ, সমৃদ্ধি দিতে চান না সন্তানকে। এগুলো সন্তানের নিজস্ব চলার পথকে বাঁধা দেবে। কবি ভালো করেই জানেই। নিখুঁত শৈশব কেউ কাউকে দিতে পারে না। তা আসলে সোনার পাথর বাটির মতোই আজগুবি। তাই তিনি উত্তরসূরীকে লড়াকু করে তুলতে চান। পৃথিবীতে টিকে থাকার একক সাহস দিতে চান কবি। তাই তিনি কোন 'সর্টকাট' রাস্তা দেখাতে চান না। বরং কিছু ভয়ংকর রাস্তাকে চিনিয়ে দিয়ে, সেই রাস্তাকে জয় করার সাহস দেন। সত্য জীবন ও জীবন সত্যকে চিনে নিতে শেখাতে চান কবি। তাই তিনি বলেন -

"আমি কোনো সর্টকাট দেখাবো না, বরং আমার
নিজের নিশানা ম্যাপ কম্পাস লণ্ঠন দূরে ফেলে দেব !
কে তোমাকে নিখুঁত শৈশব দেবে সোনার পাথর বাটি
পরমান্ন হীরার চামচে ?
কে তোমাকে ধোলাই কৈশোর দেবে, ব্রণবিষবিহীন
যৌবন ?
আমার নিকটে যত চাবি আছে সব ফেলে দেব
এখন তোমার জ্বালা আগুনে হাপরে
লৌহের মাপের গণিতে
চাবি করা, পরখ পরখ ফের, ফেলে দেওয়া
আবার বানানো !
এ ভাবেই তোমাকে আমার

টিপ্পনী

সব উত্তরাধিকার দিয়ে যেতে হবে!"

কবি নিজে যেমন দায়িত্ব নিয়ে নারীকে সচেতন, লৌহকঠিন মানসিকতার করে তুলতে চান, তেমনি তার উত্তরাধীকারীকেও যেন সে পরম্পরায় সেই শিক্ষাই দিয়ে যান। এভাবেই যে উত্তারাধিকার বাহিত হয় রক্তে রক্তে যুগে যুগে। তবেই নারীর মুক্তি। নারীর জয়।

টিপ্পনী

প্রতিচ্ছবি কেঁপে ওঠে : দেবারতি মিত্র

বেশ ছোটবেলা থেকেই কবিতা লিখতে শুরু করন দেবারতি মিত্র। কালিদাস রায় তাঁর কবিতা পড়ে প্রশংসা করেন। তুলনা করেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যয়ের সম্পাদনায় 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দেবারতি মিত্রের কবিতা প্রসঙ্গে লিখেছেন -

> "গ্রন্থ থেকেই তার সব অভিজ্ঞতা, কবিতা লিখতে এবং কবিতাকে ভালোবাসতে শিখেছে পূর্ববর্তী কবিদের কাব্যগ্রন্থ থেকেই। সেইজন্য তার শব্দ ব্যবহারে কোনো দুঃসাহসিক নতুনত্ব নেই, আঙ্গিকের আধুনিকতম পরীক্ষা নেই - পঙ্‌ক্তিগুলি নরম ও বিপন্ন, নিঃসঙ্গতাময় এবং বিরল কবিত্বে উদ্ভসিত। আন্তরিক সত্যকে স্পষ্টভাবে বলার প্রয়াসে সে নিশ্চিত আধুনিক।" (কৃত্তিবাস, ১৯৬৯)

১৯৪৬ এ জন্মগ্রহণ করা দেবারতি মিত্র পোষ্ট কলোনিয়াল ভারতীয় মানসে প্রচলিত প্রান্তিক নারীবাদীত্বের সংজ্ঞাকে রীতিমতো প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেন। যোগমায়াদেবী কলেজ এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কৃতী ছাত্রী বাংলা কবিতায় উত্তর আধুনিক এমন এক গঠন আর নির্মান শৈলীর জন্ম দিলেন যা বিশ্বব্যাপী উচ্চপ্রশংসিত। তাঁর রচনাকে একাধারে যেমন আলোকিত করে রবীন্দ্রনাথ - জীবনানন্দ, তেমনই এলিয়ট ও কীটস। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল - 'অন্ধস্কুলে ঘন্টা বাজে' (১৯৭১); 'আমার পুতুল' (১৯৭৪); 'যুবকের স্নান' (১৯৭৮) 'কবিতা সমগ্র' (১৯৯৫); 'তুন্নুর কম্পিউটার' (২০০০), 'দেবারতি মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (২০০০); 'খোঁপা ভরে আছে তারার ধুলোয়' (২০০৩); 'ভূতেরা ও খুকী' (১৯৯৮)। ১৯৬৯ এ তিনি তরুণ কবি হিসেবে কৃত্তিবাস পুরস্কার পান। ১৯৯৫ তে পান আনন্দ পুরস্কার।

কবি কবিতা সিংহ 'দেবারতি' নামে একটি কবিতায় তাঁর সম্পর্কে বলেছেন -

"তুমি দ্যাখো
তোমার ভুবন হয় দৃষ্টিতে সৃজিত তুমি
.....
তোমার হৃদয়ে জমে প্রত্যেক বর্ষার ঘোর
বেদনা চাবুক কালশিটে -
.....
সেতু-বন্ধ করে দিতে পারো তুমি যে কোনো শূন্যতা
ফেলে দিলে
যে কোনো কপালে তুমি
ফোটাও তৃতীয় চোখ, একবার কলম ডোবালে।"

এ যে নিছক স্তুতি নয়, তা তাঁর কবিতা পড়লেই বোঝা যায়।

দেবারতি মিত্রের কবিতায় আছে জীবনানন্দীয় সুররিয়ালিজম। নিসর্গ বর্ণনায় সুন্দর চিত্র কল্পের ব্যবহর। সেই প্রসঙ্গেই এসেছে অনেক উপমার ব্যবহার। যেমন 'অকুস্থলে ঘন্টা বাজে' কবিতায় তিনি বলেছেন -

"জারুল গাছের স্তব্ধ পা জড়িয়ে ধরে
বুনো সূর্যমুখী গাছ ছায়া দিয়ে আছে,
ঘড়ি বেজে গেল ধীরে বিকল প্রহরে।"

একই সঙ্গে তাঁর কবিতায় আছে শরীরী আবেদন, যা কৃত্তিবাসের অনেক কবির মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 'পৃথিবীর সৌন্দর্য একাকী তারা দুজন' কবিতায় বর্ণিত -

"প্রিয়তম পুরুষটি এক পা একটুখানি উঁচু করে
বিছানায় ভেসে আছে দেবদূত
সুকুমার ডৌলভরা মাংসল ব্রোঞ্জের উরু
অবিশ্বাস্য নিখুঁত সহজ গ্রিক ভাস্করতা
হঠাৎ সচল হয়ে ডাকে তরুণীকে।
দুহাতে জড়ানো নারী

টিপ্পনী

টিপ্পনী

তার ঊর্ধ্ব শরীরের গভীর সৌকর্য ফেলে রেখে
গা - শিরশিরে লোভে
দু-পায়ের ফাঁকে এসে মুখ গুঁজে দেয় -
.....
মেয়েটির উচ্ছল তৃপ্ত ওষ্ঠাধর, দাঁত, দুচোখের পাতা
চটচটে ঘন লাক্ষারস মাখামাখি
সজীব রঙিন শান্ত সুস্থ জানুসন্ধির মধ্যখানে
আস্তে আস্তে তার মুখমন্ডল অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে
পৃথিবীর সৌন্দর্য একাকী।

শব্দচয়নে, কল্পলোক নির্মাণে, চিত্রকল্প ও উপমা প্রয়োগে দেবারতি মিত্রের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্যণীয়।

আমাদের বর্তমান আলোচ্য কবিতাটি হল 'প্রতিচ্ছবি কেঁপে ওঠে'। কবিতাটি 'অন্ধ স্কুলে ঘন্টা বাজে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। এই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে 'দেশ পত্রিকায় যশোধর রায় চৌধুরী মন্তব্য করেন -

> "দেবারতি মিত্রের প্রথম বই 'অন্ধ স্কুলে ঘন্টা বাজে' পড়ি অনেকদিন আগে। তখন নব্বই দশক। ১৯৭১ -এর বইটি আমার কাছে এসে পৌঁছল সেই স্বচ্ছ গোলকের মতো, যা ঝাঁকিয়ে দিলেই গুঁড়ো গুঁড়ো তুষারপাত হয়, হাত ঘুরিয়ে গোল করে এনে আবার রেখে দিয়ে খানিক তুষারপাত দেখতে দেখতেই থিতিয়ে আসে সব। ছোট্ট স্বপ্নজগৎ। ছোট্ট মিথ্যেজগৎ। অথচ তার ভিতরে ঢুকে গিয়ে হারিয়ে গিয়ে, আবার কাঁচের গোলকের বাইরে ফিরে আসতে হয়। ওই, যাকে বলে কর্কশ বাস্তবে।" (দেশ, ২ নভেম্বর ২০১৬)

আমদের ও তাই মত। ছোট্ট স্বপ্ন জগৎ, ছোট্ট মিথ্যে জগতে ঢুকে পড়ে আবার ফিরে আসতে হয় বাস্তবের জগতে। 'প্রতিচ্ছবি কেঁপে ওঠে' কবিতার ক্ষেত্রেও এ কথা সমান সত্যি। কবিতাটি নানামাত্রিক প্রতিবিম্ব তৈরী করে। এটিকে প্রেমের কবিতা হিসেবে ভাবা যেতে পারে। তবে এ প্রেম, প্রেমের অণ্যতর ছবি নির্মাণ করে। আসলে 'প্রেম' শব্দটির তো নানা অর্থব্যঞ্জনা আছে। এখানে জীর্ণ কোন অর্থে প্রেমকে ব্যবহার করা হয়নি

। বোধের এক উত্তঙ্গু অর্থকে বহন করে চলে তা। আমরা বরাবরই দেখি দেবারতি মিত্র প্রাকৃতিক চিত্রকল্প রচনায় রীতিমতো সিদ্ধি অর্জণ করেছেন। এ কবিতায়ও তার সার্থক প্রমাণ দিয়েছেন। কবিতাটির মধ্যে আছে স্বপ্নবোনা, স্বপ্ন দেখা, রোমান্টিকতা। আবার বাস্তবে ফিরে আসা। শেষ পর্যন্ত এক মরসী আবেশে ডুবে থাকে। এ কবিতায় প্রকৃতি ও হৃদপ্রকৃতি মিলে গেছে। আর সেখানেই কবিতাটি এক মুগ্ধতা সৃষ্টি করে গেছে। শুরু হচ্ছে মনোজগতের কথা দিয়ে। শেষ হচ্ছে সেই মনেরই প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ দিয়ে।

টিপ্পনী

যদি ধরে নেওয়া যায় কবিতায় উল্লেখিত হৃদয়টি নারী হৃদয় এবং তা কবির, তাতেও ক্ষতি নেই। ব্যক্তি অনুভূতি শেষপর্যন্ত ব্যাষ্টি অনুভূতিতে বাঁক নেয়। কবি বলেছেন -

"কাঁচের মতন শান্ত তোমার হৃদয়ে
করুণ শাখার ছায়া আঁকা আছে সমুদ্রের দিকে।
নিবে যায় অস্ফূট আবেশে সব আলো সন্ধ্যাবেলা
তোমার কি ভালো লাগে
একাকী নীরবে কোন্‌দিকে চেয়ে আছ -"

এ তো নিজের ভালোলাগাকেই খুঁজে বেড়ানো। বৃহতের উদাররতার কাছে আমরা আশ্রয় পেতে চাই। আনমনা হয়ে যাই তার সান্নিধ্যে। যেমন সমুদ্র, মহীরূহ ইত্যাদি ঘেরা বৃহৎ প্রকৃতি আমাদের আবিষ্ট করে। তখন বাক্‌হীন অনুভব কাজ করে চলে। সেই এক ভালোলাগা। নিজেকে জানার ভালোলাগা। তখন শুধু একাকী নীরবতার ভালোলাগা। এরপর কবির চিত্রকল্পের আশ্রয় নেওয়া, যা স্বপ্ন, যা মিথ্যে আবার একই সঙ্গে সমান সত্যিও -

"ঝরঝর নদী নামে কঠিন পাথরে
তুলির মতন খেলা করে
রঙের সমুদ্রে তীব্র হাওয়ায় হাওয়ায়।
সমুদ্রের সীমারেখা হাজার হাজার,
কখনো কি শেষ হয়, কখনো কি শেষ হবে,
সে কোথায়, কবে?

টিপ্পনী

একরকম ছবি আঁকা হতে থাকে মনে মনে। এক নিরবচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক খেলার ছবি তৈরী হয়ে যায়। একটি ভালোলাগার আবেশ জুড়ে যায় বৃহৎ সমুদ্রের ব্যঞ্জনায়।

এরপর কবিতাটি নদীরই মতো আর একটি বাঁকে গিয়ে হাজির হয়। থেকে থাকে না। এখানে কবি নিজের আর একটি বিবর্তণে গিয়ে পৌঁছান। চিনে নিতে চান মনে গোপন অলিগলি। বাস্তবে যাকে অনুভব করা যাচ্ছে না, শুধুমাত্র আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাকে অন্তরে অনুভব করা যাচ্ছে। ভালো লাগছে এখানেই।

আমরা আগেই বলেছি উপমার ব্যবহার চমৎকার দেবারতি মিত্রের কবিতায়। এখানেও তিনি লতার বাঁধানো সিঁড়িকে নারীর হাতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সে সিঁড়ি কেন কবিকে ডাকে ? এতো একটু একটু করে ওপরে ওঠা। একটা বোধ থেকে আর একটা বোধে। সেখান থেকে আর একটা। এই করে করে ছবিরই (বাস্তবের) একটা প্রতিচ্ছবি তৈরী করে নেওয়া। তাতেই মগ্ন হয়ে থাকা। স্বপ্নের মত একটি প্রতিচ্ছবি বারে বারে হাতছানি দিয়ে ডাকে। বাস্তবে তার সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় না। কিন্তু সে প্রতিচ্ছবি ও এক সময় ভেঙে যায়। চিরস্থায়ী হয় না। তবে তা মোটের ওপর সুখের। তাই আবার কখনো সে প্রতিচ্ছবি কেঁপে ওঠে দেহ পটে। তার রেশটুকু থেকে যায় -

"প্রতিচ্ছবি ভেঙে যায় গভীর দুপুরে ?
তোমারও তা জানা নেই, আমার চোখের
এই পথ হারাবার ঋণ তোমার স্বীকারে
এখনও অনেক ঘুম আনে পৃথিবীতে
করুণ শাখার ছায়া ছুঁয়ে সমুদ্রের দিকে যায়।
দিক চক্ররেখা থেকে বহুদূরে আলোয় ছায়ায়
প্রতিচ্ছবি কেঁপে ওঠে আমার শরীরে,
বয়ে যায়, সারা দিন ধরে বয়ে যায়।"

ভালোবাসা ৩, ৪ : নবনীতা দেবসেন

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

নবনীতা দেবসেন পঞ্চাশের দশকের বাংলা সাহিত্যের একজন অগ্রগণ্য রচনাকার। তিনি কবি; তিনি গদ্যকার। গদ্যে-পদ্যে তিনি সমান দক্ষ হলেও, তাঁর ভালোলাগার জায়গা কবিতা। কবিতার পরিমন্ডলে তাঁর বেড়ে ওঠা। বাবা নরেন্দ্র দেব

এবং মা রাধারাণী দেবী দুজনে স্ব-কালের খ্যাতনামা কবি। শুধু তাই নয় নবনীতা দেবসেনের অনেক সহপাঠী যাঁরা পঞ্চাশের প্রতিষ্ঠিত কবি। প্রথম জীবনে বাবা-মা'র সঙ্গে দেশে বিদেশে ভ্রমণ, পরে, কর্মসূত্রে ও বিবাহিত জীবন সূত্রে বিদেশেগমণ ও প্রবাসী জীবন - তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরিয়েছে। এই জীবনাভিজ্ঞতাই তাঁর সাহিত্যে, বীশেষত কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে।

টিপ্পনী

তিরিশ ও চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতায় নারী লেখকদের পাওয়া যায় না বললেই চলে। কেবল রাজলক্ষ্মী দেবীর কথাই জানা যায়। পঞ্চাশের দশকে অন্তত দু'জন মহিলা কবির আবির্ভাব ঘটে। একজন কবিতা সিংহ অন্যজন নবনীতা দেবসেন। আমরা নবনীতার কবিতাকে মহিলা কবির রচনা হিসেবে দেগে দিতে চাইছি না। কবিতার প্রথম ও প্রধান পরিচয় কবিতাই, অন্যকিছু নয়। পাশাপাশি এ কথাও সত্য যে জৈবিক ও সামাজিক কারণে পৃথিবী সম্পর্কে নারী ও পুরুষের সংবেদনা কিছুটা আলাদাই হয়। যেহেতু পুরুষের তুলনায় মেয়েরা নির্বাধ ভাবে নিজেদের প্রকাশ করবার অবকাশ পেয়েছে কম, তাই তাঁদের সেই ভিন্ন সংবেদনায় গৃহীত পৃথিবি আমাদের চোখেও পড়েছে কম। তবু রাজলক্ষ্মী দেবী, কবিতা সিংহ, নবনীতা দেবসেনের কলম ধরেই বাংলা কবিতা নিজের শরীরে এঁকে নিলো মহিলা কবির স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের চিহ্ন। তাঁদের রমণীত্ব ব্যক্তিত্ব রূপেই প্রতিষ্ঠিত হল। কখনো তার প্রকাশ মৃদু - যেমন রাজলক্ষ্মী দেবীর লেখায়। কখনো তীক্ষ্ণ যেমন কবিতা সিংহের রচনায়, আর কখনো গাঢ় সংসক্ত যেমন নবনীতা দেবসেনের কবিতায়।

নবনীতা দেবসেনের সেইসব 'গাড় সংসক্ত' কবিতার সংখ্যা অনেক হলেও, তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা সীমিত। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র 'নিবেদন' - এ তিনি লিখেছেন -

> "এতদিন ছেদহীনভাবে কবিতা প্রকাশিত হলেও ১৯৭১ এর পরে আমার কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি, শুধু গদ্যগ্রন্থই বেরিয়েছে। সেজন্য এখানে বই থেকে চয়িত ও অগ্রন্থিত কবিতা সংখ্যায় প্রায় সমান।"

১৯৫৯ -এ নবনীতার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম প্রত্যয়' - এর প্রকাশ'; ১৯৭১ - এ প্রকাশিত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'স্বাগত দেবদূত'। এছাড়া তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল - 'তিনভুবনের পারে'; 'নারী তুমি অর্ধেক আকাশ'; 'ভালোবাসা কারে কয়'; 'মেদেয়া এবং'; 'শব্দ পড়ে টাপুর টুপুর'; 'সাত কন্যের দেশ' প্রভৃতি।

টিপ্পনী

আমাদের এখানে আলোচ্য কবিতা 'ভালোবাসা'। তিন ও চার সংখ্যক কবিতা। এ কবিতাকে বুঝতে গেলে নবনীতা দেবসেনের লেখনী শৈলীকে জানা জরুরী। তিনি মূলত মুক্ত চেতনার কবি। নারী পুরুষের সমানাধিকার চাওয়া একজন কবি। তাঁর চোখে বারে বারে ধরা পড়েছে নারীর প্রতি পুরুষের অবমাননা, একদেশদর্শীতা। তার বিরুদ্ধেই তিনি কথা বলেছেন, গলা তুলেছেন। এছাড়া তাঁর কাব্যজীবনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তাঁর বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ পরবর্তি সময়। যার প্রভাব তাঁর কাব্যে পড়েছে। কখনও তা দুঃখের আকারে ধরা দিয়েছে। কখনো বা তা স্মৃতি হিসেবে। এই দিকগুলো মাথায় রেখে কবির কবিতাকে পাঠ করা যেতে পারে। 'ভালোবাসা'র অনেকগুলি কবিতা আছে। তারমধ্যে আমাদের তিন ও চার সংখ্যক কবিতা পাঠ্য।

আমাদের পাঠ্য কবিতা দুটি নিখাদ ভালোবাসায় মোড়া এমন কথা বলা শক্ত। শুরু হচ্ছে যেন কিছু একটা অভিযোগের উত্তর দিতে দিতে। যদি আমি আমার মতো করে কিছু চাই তাতে ক্ষতি কি ! কার কি এল গেল ! ভালোবাসাতো একমাত্রিক নয়। তার নানান রঙ। নানান অর্থ। আমাকে কেউ একদল বলে নিশ্চয়ই দিতে পারে না যে আমি কেমন ভাবে ভালোবাসাকে গ্রহণ করবো। কবি বোধ করি এমন বার্তা দিয়ে নিজস্ব ভাবনার গভীরে ঢুকতে চেয়েছেন। ভালোবাসার কাছে তাঁর অনেকখানি দাবি। অনেকখানি চাওয়া। তা শুধু ধূপগন্ধী শুদ্ধতার মোড়ক নয়। রক্ত-মাংসের দেহের সবটুকু দিয়ে পাওয়ার চেষ্টা। তাই তিনি ভালোবাসায় 'পাখির নীড়ের' ভরসা চান। বটবৃক্ষের ছায়া চান, আশ্রয় চান। ইন্দ্রিয়ময় স্পর্শ চান। কিছু তারল্যদীপ্ত মৃদ্যু মুহূর্ত চান খোলা আকাশের নিচে নক্ষত্রের আলোতে। এই চাওয়া স্বাভবিক, সংগত, ন্যায্য। মৃত্যুই শাশ্বত। তার কাছে থেকে পাওয়া জীবত্কালটাকে কবি দেহে মনে প্রাণে পরখ করতে চান। এতে কে কি ভাবল তাকে তিনি পরোয়া করেন না। একটাই তো জীবন আমাদের তাই সে জীবনের সমস্ত ভাঁড়ার পূর্ণ করে যেতে চান তিনি। ভালোবাসা একটি সুকোমল মিঠে অনুভূতি তা কেবল শরীরী নয়, তা যাপন করবারও বটে। তাই তিনি করতে চান। পেতে চান ভালোবাসার কাছ থেকে এ সব স্বাদ। জীবন সব সময়ই চমকপ্রদ। অপ্রত্যাশিত। কখন কি ঘটে জীবনে, কে আসে, কে যায়, কোন কিছুই আগে থেকে বোঝা যায় না।

"যার দ্বারে গিয়ে ভেবেছিলে নেবে ভিক্ষে
সে এসে দাঁড়ায় বাটি-হাতে দোরগোড়াতে !"

এমনই জীবন। হিসেব মেলে না। আমি জিততে চাইলেও সব সময় তা হয়ে ওঠে না। কিন্তু জেতার ইচ্ছে মরে না, যে প্রেম পেয়ে ধন্য হতে চাওয়া। সে প্রেম আমাকে পেয়ে ধন্য হলে আর আকর্ষণ কোথায়, কোথায় রহস্য ! এতো জিৎ নয়। তাই 'তো চাই কিছু কিছু জিৎ ইচ্ছের সেই কারণেরই পরজন্মেও সেই তৃষ্ণা থেকে যায়। কবি তাই কবিতার (ভালোবাসা - ৩) শেষ দুই পংক্তিতে অমোঘ উচ্চারণ করেন -

"আছে ইন্দ্রিয় যতদিন, থাক তীব্র

তৃণের সঙ্গে সূর্যকরের সাক্ষাৎ....."

এ ভালোবাসাকে তিনি চেয়েছেন। ঘাসের সঙ্গে সূর্যকরের সাক্ষাতে যে নিবিড়তা তৈরী হয়, যে আকাঙ্ক্ষা তৈরী হয়, সে ভালোবাসাই তিনি চান। তা যদি ইন্দ্রিয় পথে আসে; আসুক। তিনি আসলে ভালোবাসার সারকে পেতে চান। তাই তিনি এমন স্পষ্ট উচ্চারণে এ কথা জানান দেন।

আবার চার সংখ্যক কবিতায় ভালোবাসার নতুনতর রূপ প্রকাশিত কবির হাতে। এখানে ভালোবাসার মূল বা শিকড় সন্ধানের চেষ্টা দেখা যায়। মূলত কবির রোমান্টিক মনের ভালবাসার মধ্যে আত্যন্তিকতা আছে, আন্তরিকতা নেই। ভালোবাসা সেই সমস্ত কবিদের কাছে 'সাবজেক্ট' বা বিষয়। কোন কোন কবি বলেছেন -

"ভালোবাসা, তুমি সুদূর শঙ্খচিল....."

তারপর তাকে কল্পনার ডানায় উড়িয়ে দিয়েছেন আকাশে। চলে গেছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। হয়ে উঠেছে অমর্ত্যচারী। আবার কেউ 'ভালোবাসা, তুমি দাঁড়ে বসা কাকাতুয়াটি' বলে তাকে ধরবার ছলে 'শেকলে বেঁধেছে দালানে'। আবার 'ভালোবাসা, তুমি বহুকাল গৃহহারা' বলে কেউ তাকে 'বাড়িয়ে দিয়েছে রাস্তায়'। ভালোবাসাকে মর্ত্যলোকের, মানব-মানবীর, ম গৃহকোণের করে কেউ ভাবেন নি।

কবি, কবিদের এই প্রবণতাকে মনে করেছেন ভালোবাসার অবমূল্যায়ন। তিনি গৃহের সুখে। অতীতে ইতিহাসে, আবহমান কালের মধ্যে ভালোবাসার সুগন্ধকে খুঁজে পেতে চেয়েছেন। তাঁর কাছে ভালোবাসা জীবনেরই এক অপরিহার্য অনুভূতি। তাকে পরম যত্নে ঘরে এনে না বসালে সে অতিথির মতোই মাঝে মধ্যে দেখা দেবে। সঙ্গের সঙ্গী হবে না। নইলে কবি কেন বলবেন -

টিপ্পনী

টিপ্পনী

"ভালোবাসা তুমি কবিদের কথা শুনো না
এসো, ভালোবাসা, পা ধুয়ে বোসো এ পিঁড়িতে
এখানে তোমার চেনা ভিটে সাতপুরুষের।"

'ভালোবাসা' শব্দটি বহু ব্যবহারে জীর্ণপ্রায়। কিন্তু তার একটা ঠিকানা আছে, মর্যাদা আছে। তারও সাতপুরুষের ভিটে মাটি আছে। তাকে নিমেষে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাকে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া যায় না। তাকে শেকলে বেঁধে ফেলাও যায় না। তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে ঠিক আসনটিতে বসাতে হয়। তবেই তাকে পাওয়া যায়। তাকে যাপন করবার যোগ্য হয়ে ওঠা যায়।

ভালোবাসা কারুর ব্যক্তিগত প্রসাধন নয় যে যথেচ্ছ মেখে নিলেই হলো। তার নিজস্ব সত্তা আছে। আছে চলন। তাকে পেতে গেলে তার কাছে নত হতে হবে। তাকে সম্মান দেখাতে হবে। তবে সে রসের সন্ধান মিলবে। তাই কবি নিজে ভালোবাসাকে মর্যাদা দিয়েছেন। সমাদর করেছেন তার। ক্লিশে হয়ে যেতে দেন নি তাকে। বিষয় হিসেবেও ভাবেন নি। জীবনের সহজাত অংশ হিসেবে দেখেছেন। 'ভালোবাসা' তার কাছে কেবল শব্দ বন্ধ নয় একটি। পরম ধন। যাকে যত্ন করতে হয়। লালন করতে হয়। তিলে তিলে তার পরিচয়ের উৎসে পৌঁছুতে হয়। তাই ভালোবাসা তাঁর কাছে নিত্য। সত্য। দৈনন্দিন। সে কারণেই তিনি বলতে পারেন -

"এস ভালোবাসা, বোসো এইখানে সোফাতে -
চা খাবে? পাখাটা বন্ধ করে দি? জানালা?
শরীর গতিক ভালো তো? চাকরি বাকরি?
তারপর? বড়ো শীত পড়ে গেল অকালে। (ভালোবাসা - ৫)

ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে : মল্লিকা সেনগুপ্ত

মল্লিকা সেনগুপ্ত (২৭.০৩.১৯৬০ - ২৮.৫.২০১১) একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক ও ঔপন্যাসিক। সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা মল্লিকা ১৯৮১ সাল থেকে লেখা শুরু করেন। তখন থেকেই তিনি জনপ্রিয়। তাঁর লেখা বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর লেখনীর মূল বৈশিষ্ট্য হল, মেয়েদের যন্ত্রণার কথা বাঙ্ময় ভাষায় প্রকাশিত তাঁর কাব্যে। বিশেষত মেয়েদের দুঃখ, দুর্দশা, হাতাশা, লাঞ্ছনা, উপেক্ষা ও অসম সামাজিক অবস্থানের বিরুদ্ধে বারে বারে তাঁর কবিতা গর্জে উঠেছে। তাঁর নিজের কথায় - 'আমি কান্না পড়ি, আগুন

লিখি, নিগ্রহ দেখি, অঙ্গার খাই, লাঞ্ছিত হই, আগুন লিখি।" তাই মল্লিকার কবিতা সংবেদনশীল, আপষহীন রাজনৈতিক ও নারীবাদী। সমসাময়িকতা ও ইতীহাসমুখীতাও তাঁর কাব্যের এক বিশেষ দিক। ইতিহাসের ব্রাত্য নারী চরিত্ররা প্রায়ই তাঁর লেখায় পুনর্জীবিত হয়েছে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চল্লিশ চাঁদের আয়ু' (১৯৮৩), শেষ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'বৃষ্টি মিছিল বারুদমিছিল' (২০০৯)। তাঁর অন্যান্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল - 'সোহাগশর্বরী' (১৯৮৫), 'আমি সিন্ধুর মেয়ে' (১৯৮৮), 'হাঘরে ও দেবদাসী' (১৯১১) 'অর্ধেক পৃথিবী' (১৯৯৩), 'মেয়েদের অ আ ক খ' (১৯৯৮), 'কথামানবী' (১৯৯৯), আমার লাস্য আমার লড়াই' (২০০০), 'দেওয়ালির রাত' (২০০০), 'পুরুষকে লেখা চিঠি' (২০০৩), 'ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে', 'আমাকে সরিয়ে দাও', 'ভালোবাসা' প্রভৃতি ২০ টি কাব্যগ্রন্থ, ২ টি উপন্যাস ও বেশকিছু প্রবন্ধ তিনি লেখেন। তাঁর উপন্যাস দুটি হল - 'সীতায়ন' (১৯৯৫), 'শ্লীলতাহানির পরে' (১৯৯৬)।

মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর লেখার জন্য স্বীকৃতি পান। ১৯৯৮ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা সুকান্ত পুরষস্কারে ভূষিত হন। ২০০৪ এ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী তাঁকে অনিতা সুনীল বসু পুরস্কারে সম্মানিত করে। ক্যানসারে ভুগে তিনি মারা যান ২০১১ তে।

মল্লিকার কবিতা ছাপা হয়ে পাঠক - পাঠিকার হাতে আসে মাত্রই আলোড়ন তৈরী হয়। প্রথম কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে সামাজিক প্রেক্ষাপটে নরনারীর সম্পর্ক। 'ঘর' কবিতাটিতে তিনি লেখেন -

"বাঁশের মাচান বাঁধো সঙ্গমের আগে, ঘর হবে
পুত্র বেঁধে নেব পিঠে
নদী দৃষদ্বতী আজো বইছে সেখানে, পলি,
নতুন উদ্ভিদ।"

নারী নিজ নিকেতন চায়। ঘুরতে চায় না আর যাযাবর হয়ে পিঠে পুত্র বেঁধে নিয়ে ঋগ্বেদের দৃষদ্বতী নদীর তীরে চলে যাবে। সেখানে আছে পলি, নতুন উদ্ভিদ। এভাবেই মিলে যায় ইতিহাস ও বর্তমান তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতায় স্থান পায় নির্যাতিতা মহিলারা, লড়াকু মহিলারা। স্কুলবাসে যৌন হেনস্থার শিকার হয় যে ছোট্ট মেয়েটি - সে মেয়ে উঠে আসে মল্লিকার লেখার পাতায়।

অর্ধেক পৃথিবী' (১৯৯৩) থেকে মল্লিকা অনেক স্পষ্ট। তাঁর কবিতা রাজনৈতিক।

টিপ্পনী

সমসাময়িক। উঠে আসে 'ইনস্যাট ১' - এর কথা। গুজরাট দাঙ্গা, মেথা পাটেকর, খেজুরী, প্রিয়ঙ্কা-রিজওয়ানুর ইত্যাদি শব্দ ঢুকে পড়ে তাঁর কবিতায়। রাজনৈতিক পক্ষ নিয়ে তিনি লেখেন -

"নিশ্চিন্দপুরের পথে শিল্পায়ন হলে সর্বজয়ার
সংসারটা হয়তো বেঁচে যাবে।"

টিপ্পনী

মল্লিকার কবিতা গ্রন্থগুলির ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখা যায় ক্রমে তাঁর কবিতা একটি লড়াইয়ের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। তবে কবির কাব্যে নারীর প্রতিবাদ থাকলেও তথাকথিত পুরুষ বিদ্বেষ নেই।

ইতিহাস নিয়ে তাঁর কবিতা নতুন ধারণার জন্ম দেয়। যে ভাবে যে বিষয়টিতে এর আগে দেখা হয় নি, ভাবা হয় নি, অথচ ভাবা উচিত ছিল - মল্লিকা ইতিহাস থেকে সে ভাবনা ভাবেন ও আমাদের ভাবান।

এ প্রসঙ্গে তাঁর 'ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে' কবিতাটির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। এখানে মল্লিকা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় আক্রমণ করেছেন এ সমাজকে। এমনকি কার্ল মার্কসকে তিনি এনেছেন এ কবিতায়।

মল্লিকা কবিতাটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি বক্তব্যকেই জোরালো করেছেন। সমাজে নারী কাল - কালান্তর ধরে উল্লেখহীন, স্বীকৃতিহীন। অথচ নারী না থাকলে এ সমাজের প্রকৃতই কোন অস্তিত্ব নেই। নারীর গর্ভেই সমাজের অঙ্কুর থাকে। পুরুষ সমাজের জন্য যে য কীর্তি স্থাপন করেছে তার সবেতেই নারীর উৎসাহ, উদ্দীপনা, ত্যাগ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁকে সমাজ স্বীকৃতি জানাতে কুণ্ঠাবোধ করে। নারীর নিজের অধিকারকে বুঝে নেওয়ার জন্য, নারীর পক্ষে কলম ধরেন মল্লিকা।

কবিতাটিতে পাঁচটি স্তবক আছে। স্তবকে স্তবকে একটু একটু করে মূল বক্তব্যকে ক্রমশ তীক্ষণ করেছেন কবি। শেষ স্তবক একটি মাত্র বাক্য নিয়ে। এই বাক্যটিকে বলা যেতে পারে এ কবিতার 'ক্লাইম্যাক্স'।

প্রথম স্তবক তিনি তাঁর উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে বলতে শুরু করেছেন।একটা যন্ত্রণাক্লিষ্ট ব্যঙ্গ আছে শুরুর স্তবকে।ক্রমশ তা বিস্ফোরণের আকার নিয়েছে। ইতিহাস থেকে তিনি নিজের বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন। আজ থেকে প্রায় ৩৫ - ৪০ হাজার বছর আগের জাভাম্যান, ক্রোম্যাগনন কিম্বা নিয়েনডার্থানাল ম্যানরা; এই বর্বর পুরুষেরা প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে, ভোঁতা পাথরের অস্ত্রে ভাল্লুক মেরে টিকে

থেকেছে। ক্রমে ক্রমে সভ্যতা নির্মাণ করেছেন। তাদেরই উত্তরসূরী সভ্য আধুনিক মানুষ বাঁশ থেকে আড়বাঁশি বানিয়ে বাজাতে শিখেছে। কিন্তু এসবই তো পুরুষের কীর্তি। নারী কোথায় ? ইতিহাসে কি তার কোন গরিমা লিপিবদ্ধ নেই ? মল্লিকা তাই প্রশ্ন তোলেন -

"ছায়া ছায়া মানবীরা পাশে ছিল, তবুও ছিল না"

টিপ্পনী

দ্বিতীয় স্তবকে মানবসভ্যতার বিবর্তনকে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন। পলিওলিথিক ম্যানের (এরা ইউরোপের আসা প্রথম মানুষ। এরা ৪০ হাজার বছর আগে ছিল। ইউরোপের প্রথম অ্যানাটমিক্যালি মর্ডান মানুষ।) যুগ চলে গেলে আসে লৌহযুগ। প্রস্তর যুগ, লৌহযুগ - এসব যুগের নারীরা কি ভুমিকা নিয়েছিল সভ্যতা গঠনে ? তাদের কথা ইতিহাস কি বিশ্রুত হ'ল ? তাই কবির শ্লেষ মেশানো উচ্চারণ নারীর জন্য -

"এই আদি মানুষেরা সবাই পুরুষ
আমরা হিস্ট্রি থেকে জানতে পেরেছি।"

কবির এ বক্তব্য প্রমাণ করে ইতিহাসের পক্ষপাতকে।

মানব বন্দনার এমন ইতিহাস দেখে তিনি (কবি) যেন আরো দৃঢ়, আরো নির্দিষ্ট তাঁর বক্তব্যে। এবার আমরা তাঁর তীব্র, প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। নারীদের প্রতি এতই বঞ্চনা করেছে ইতিহাস যেন এই পুরুষেরা নারীদের ছাড়া জন্ম নিয়েছে, পুরুষের নারীকে যেন প্রয়োজনই হয়নি। সভ্যতার বিবর্তনে পুরুষ কি তাহলে সমগামী ? ইতিহাস কি শুধুই পুরুষের শৌর্যের ইতিহাস ? লেখক বলে চলেন -

"পূর্ব পুরুষেরা একা, একা একা উত্তরপুরুষ
উত্তরমানুষ নেই, পূর্বনারী নেই আমাদের ;

তাঁর ক্ষোভ আরো বেশি করে প্রতিবাদ হয়ে ঝরে পড়ে এবার। তিনি বলেন -

"হিস্ট্রি তো শোর্যবীর্যে ভরা 'হিজ স্টোরি'
আমরা বুঝেছি নারী ছিল না তখন ;"

চতুর্থ স্তবকে সেই তীক্ষ্ণ প্রশ্নগুলি তিনি সভ্যতার সামনে তুলে ধরেন। যা আমাদের ভাবা। যা আমাদের আরো একবার মনে করিয়ে দেয় সমাজে নারীর বঞ্চনার কথাকে লনারী এখানে দলিত। যার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার এক দীর্ঘ ইতিহাসকে মল্লিকা সেনগুপ্ত তুলে ধরেন এ কবিতায়। এখানে তিনি সমাজের মুখে এক একটা

টিপ্পনী

চপেটাঘাত স্বরূপ এক একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন অদ্ভুত বিবৃতিমূলক বর্ণনায় -

"জাভাপুরুষের গর্ভে পুরুষের জন্ম হয়েছিল
নিয়েনডার্থাল ম্যান শিশুদের স্তন্যদায়িনী
জাভা বা নিয়েনডার্থে মানুষেরা শুধুই পুরুষ
পুরুষ একাই ছিল ভাগ্যবান আর ভগবতী
পুরুষ জননী ছিল পুরুষ জনক
পুরুষ স্বয়ং সুর এবং বাঁশরী
পুরুষ স্বয়ং লিঙ্গ এবং জরায়ু
আমরা হিস্ট্রি থেকে এ রকমই জানতে পেরেছি"

আমরা সবাই জানি এ সম্ভব নয়। নারীকে বাদ দিয়ে এ সভ্যতার কোন অস্তিত্ব, কোন অগ্রগমণ নেই। লেখকের এখানেই প্রশ্ন যদি তাই হয়, তাহলে মানবীরা কোথায় ? তাদের উল্লেখযোগ্য অবস্থানকে ইতিহাস কেন স্বীকার করবে না ? কবি এমন ইতিহাসকে একেবারেই মানতে চাননি। যে ইতিহাস পক্ষপাতদুষ্ট, বাহুবলকে প্রকৃত শক্তি বলে মান্যতা দেয়ে, নারীর শক্তিকে বিজ্ঞাপিত করে না, সে ইতিহাস তাঁর কাছে মূল্যহীন। আর সে ইতিহাস যাঁরা লিখে ইতিহাসবিদ্ তকমা পেয়েছেন তাদের প্রকৃত কোন সত্য নেই, তাদের সত্তাকে তিনি স্বাভাবিক মনে করেন না। তাই তো এমন ধারালো উচ্চারণের আঘাত নামিয়ে আনতে পারেন তিনি অকপটে -

'আসলে হিজড়ে ছিল ইতিহাসবিদ্।"

আসলে নারীর বঞ্চনার ইতিহাস হাজার হাজার বছর ধরে এ সভ্যতার বুকলে লেগে রয়েছে। সেখান থেকে নারীকে 'আপন ভাগ্য জয়' করতে গেলে ক্ষীণ কণ্ঠে কাতর আবেদন নিবেদন করলে আর চলবে না, এ কথা কবি ভালো করেই জানেন। তাই তাঁর প্রতিবাদ শানিত তরবারির মত ফুঁসছে সমাজের বুকের ওপর। প্রতিবাদে চকিত হয়েছে এ সমাজ, এ ঐতিহ্য।

তবু ফিরব : তসলিমা নাসরিন

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

তসলিমা নাসরিন (জন্ম ২৫ আগস্ট, ১৯৬২) ওপার বাংলার শক্তিশালী নারীবাদী লেখক। বিতর্কিতও বটে। তাঁর প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন ডাক্তার। কিন্তু নারীদের

সামগ্রিক পরাধীনতা তাঁকে বারে বারে বিচলিত করত। ১৯৮০-র দশকের শেষ দিকে তাঁর সাহিত্যের জগতে পাকাপাকিভাবে পা রাখা । তাঁর লেখার বিষয় নারী স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবতা । নব্বই-এর দশকের শেষের দিকে নারীবাদী ও ধর্মীয় সমালোচনামূলক রচনার কারণে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পান । তাঁর রচনা ধর্মীয় মৌলবাদীদের আক্রোশের কারণ হয়। একদল মৌলবাদী তাঁকে হত্যার হুমকি দেওয়ায় ১৯৯৪ সালে তিনি বাংলাদেশ ত্যাগ করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করতে বাধ্য হন।

টিপ্পনী

ময়মনসিংহ শহরে জন্ম হয় নাসরিন জাহান তসলিমার। তের বছর বয়সে তাঁর কবিতা লেখার সূত্রপাত। কলেজে পড়ার সময় ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত তিনি 'সেঁজতি' নামক একটি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। ১৯৮৬ তে তাঁর প্রথম কবিতা সংকলন 'শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা' প্রকাশিত হয়। তারপর একে একে নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে' (১৯৮৯), 'আমার কিছু যায় আসে না' (১৯৯০) প্রকাশিত হয়। এই সময় থেকে নারীর প্রতি মুসলিম মৌলবাদীদের শোষণ, অত্যাচারের কথা লিখতে থাকেন পত্র-পত্রিকায় । মৌলবাদীরা ক্ষিপ্ত হে ওঠে। এই সময়ে, ১৯৯২ সালে 'নির্বাচিত কলাম' প্রবন্ধেদর জন্য তসলিমা 'আনন্দ' পুরস্কার পান। ১৯৯৩ সালে তিনটি কাব্যগ্রন্থ, দুটো ছোটগল্পো, দুটি প্রবন্ধ এবং 'লজ্জা' সহ পাঁচটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। 'লজ্জা' খুব হৈচৈ ফেলে দেয়। দেশে - বিদেশে। মুসলিম মৌলবাদীরা তাঁর ওপর শারীরিক নিগ্রহ করে 'লজ্জার' জন্য । এই সময় থেকে এক এক করে তাঁর অনেক লেখা নিষিদ্ধ হয় বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষে। 'আমার মেয়েবেলা' গ্রন্থের জন্য তিনি দ্বিতীয় বার আনন্দ পুরষ্কার পান ২০০০ সালে।

১৯৯৪ সালে একটি পত্রিকার সাক্ষাৎকারে তিনি ইসলামী ধর্মীয় আইন শরিয়া অবলুপ্তির মাধ্যমে কোরাণ সংশোধনের ইচ্ছে প্রকাশ করেন। মৌলবাদীরা তাঁর ফাঁসির দাবি করে এ কারণে। বাংলাদেশ সরকার তাঁর বিরুদ্ধে জনগণের ধর্মীয় ভাবাববেগকে আঘাত করার কারণে মামলা রুজু করে। জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয় তাঁর বিরুদ্ধে । পরবর্তীতে উচ্চ আদালতের নির্দেশে তাঁর জামিন মঞ্জুর হলে তিনি বাংলাদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

বাংলাদেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে ১৯৯৪ তে সুইডেনে এবং ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত জার্মানিতে বসবাস করেন। ১৯৯৭ তে সুইডেন ফিরে গেলে রাজনৈতিক নির্বাসিত হিসেবে জাতিসংঘের ভ্রমণ নথি লাভ করেন । এই সময় তিনি সুইডেনের নাগরিকত্ব পান। তখন সুইডিশ কর্তৃপোক্ষের কাছে তাঁর বাংলাদেশের পাসপোর্ট জমা দেন। ১৯৯৮

তে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেন। এই সময় তাঁর মায়ের অসুস্থতার কারণে অনেক কষ্টে বাংলাদেশে এলে পুনরায় তার বিরুদ্ধে জামিন গ্রেপ্তারিও পরোয়ানা রুজু হয়। আবার তিনি দেশ ছাড়েন। ১৯৯৯ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত তিনি ফ্রান্সে থাকেন। ২০০২ সালে তসলিমার বাবা মৃত্যু সজ্জায় শায়িত হলে তসলিমা বাংলাদেশে প্রবেশের অনুরোধ করেও ব্যার্থ হন। ২০০৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে অস্থায়ী ভাবে বসবাসের অণুমতি দিলে তিনি কলকাতায় থাকতে শুরু করেন। কলকাতাতেও তাঁকে বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের তীব্র রোষাগলে পড়েন। এই সময় ভারত সরকার তাঁকে সাতমাস একটি গোপন জায়গায় গৃহবন্দী করে রাখে। ২০০৮ এর ১৯ মার্চ তসলিমা ভারত ছাড়তে বাধ্য হন। ২০১৫ থেকে তিনি আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

টিপ্পনী

তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি হ'ল-'শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা' (১৯৮৬), 'নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে'(১৯৮৯), 'আমার কিছু যায় আসে না' (১৯৯০), 'অতলে অন্তরীণ' (১৯৯১), 'বালিকার গোল্লাছুট' (১৯৯২), 'বেহুলা একা ভাসিয়েছিল ভেলা' (১৯৯৩), 'আয় কষ্ট ঝেঁপে, জীবন দেবো মেপে' (১৯৯৪), 'নির্বাসিত নারীর কবিতা' (১৯৯৬), 'জলপদ্য' (২০০০), 'খালি খালি লাগে' (২০০৪), 'কিছুক্ষণ থাকো' (২০০৫), 'ভালোবাসা ? ছাই বাসো !' (২০০৭), 'বন্দিনী' (২০০৮)।

এর বাইরেও তিনি বেশ কিছু প্রবন্ধ, আটটি উপন্যাস, কিছু ছোটগল্প, সাতটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। অনেকগুলি বিতর্কিত লেখা। যা তাকে খ্যাতি ও অখ্যাতি দুইই দিয়েছে।

তসলিমা নাসরিনের 'তবু ফিরব' কবিতাটি নির্বাসিত নারীর কবিতা' (১৯৯৬) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। 'তবু ফিরব' কবিতাটি আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে যায় জীবনানন্দ দাশের 'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটির কথা। কবির বাংলার মাঠ-ঘাট-প্রান্তরের প্রতি গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে কবিতায়। তিনি এতই মাটির টানে বদ্ধ যে, মানব জন্মের সমাপ্তির পর শংখচিল বা শালিখের বেশে হলেও তিনি বাংলাদেশে ফিরতে চেয়েছেন -

"আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে - এই বাংলায়

হয়তো মানুষ নয়, হয়তো বা শংখচিল শালিখের বেশে"

তবে জীবনানন্দের উচ্চারণ আর তসলিমার উচ্চারণের মধ্যে মূলগত ফারাক আছে। যদিও দুজনেই ফিরতে চেয়েছেন জন্মভূমিতে।

আমরা ইতিমধ্যেও উল্লেখ করেছি তসলিমার ব্যক্তি জীবনের নানান প্রতিঘাতের কথা। তাঁর লেখনীর কারণেই তিনি বারে বারে বিড়ম্বনার পড়েছেন। তাঁকে তাঁর নিজের দেশ ছাড়তে হয়েছে। মূলচ্ছিন্ন হয়ে তাঁকে বারে বারে এদেশ সেদেশ করতে হয়েছে। গৃহবন্দীর জীবন কাটাতে হয়েছে। ছাদ হয়েছে তাঁর আকাশ। একজন মুক্তমনা সংবেদনশীল স্পষ্টবাদী লেখকের এই অবস্থা সত্যিই খুব অসহনীয়। যন্ত্রণায় যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে তাঁর মনোজগত। মা অসুস্থ, বিদেশ থেকে অনেক জটিল আন্তর্জাতিক পক্রিয়া চুকিয়ে কোন মতে নিজের সাধের বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছেন, ওমনি তাঁর বিরুদ্ধে জারি হয়েছে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। কোনক্রমে আবার দেশ ছেড়ে পালিয়ে বাঁচেন। বাবা মৃত্যু শয্যায় শায়িত, এমতাবস্থায় তসলিমা দেশে ফেরার অনুমতি চেয়েও পাননি। এর চাইতে অধিক যন্ত্রণা আর কিই বা হতে পারে। কবির পক্ষে তো এ বেদনা আরো গভীর। এমনই ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়ে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে যাযাবরের মতো, একদেশ থেকে আর এক দেশে এখনো। তাই তাঁর কাছে জন্মভূমিতে ফেরার অনুভূতি কারোর সাথে মিলবে না। তাঁর ফেরার উচ্চারণে যে আকুলতা থাকবে তা তো অন্তর নিঙড়ানো হবে। সে আর্তির বিস্তার কাল থেকে কালে প্রসারিত।

তসলিমা এ কবিতার শুরুতেই এক বিষাদময় ছবি এঁকেছেন। পাঠককেও এক লহমায় টেনে এনে ফেলেছেন নিজের অণুভূতির বৃত্তে। কথোপকথনের ঢঙে বলেছেন -

> "আমার জন্য অপেক্ষা করো মধুপুর, নেত্রকোনা অপেক্ষা করো জয়দেবপুরের চৌরাস্তা আম ফিরব।"

মানুষের অন্তরের শাশ্বত বেদনাকে টেনে বের করে এনেছেন কবি তাঁর বর্ণনার যাদুতে। মুহূর্তে পাঠক কবিবির সত্তায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে ঐ ট্র্যাজিক চরিত্র হিসেবে ভাবতে থাকেন, যে কিনা এক সময় মধুপুর, নেত্রকোনায়, জয়দেবপুরে দৌড়ে-ছুটে বেড়িয়েছেন। তাঁর ছোটবেলা পরম আনন্দে লেবুতলায় ঘুরে ঘুরে, গোল্লাছুট খেলে, দোলনায় দুলে, বাঁশবনের পুকুরে ছিপ ফেলে কাটিয়েছেন। সেই দস্যিপনার কথা বড়বেলায় ভেবে ; দূরদেশ থেকে ভেবে, চাইলেও আর আসতে না পারার বেদনা থেকে ভেবে ক্ষত বিক্ষত করে দিচ্ছেন মনলোককে। এই বেদনাবোধ এফোঁড় ওফোঁড় করে দিচ্ছে যেমন কবি মনকে তেমনি সমান ভাবে পাঠককে।

দ্বিতীয় স্তবকে ঝরে পড়েছে কবির ব্যক্তি জীবনের যন্ত্রণাজাত উপলব্ধি। কবি

টিপ্পনী

তাঁর প্রিয়জনদের কাছে ফিরতে চেয়েছেন। তাঁর মা ইদুল আরাকে সম্বাধন করেও তিনি বলেন -

‘অপেক্ষা করো ইদুল আরা,

আমি ফিরব।

তিনি চান সব যেন আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে যায়। বাংলাদেশের প্রতিটি কোনে তিনি যেন স্বছন্দে যেতে পারেবন। তাই তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় -

“ফিরব ভালবাসতে, হাসতে, জীবনের সুতোয় আবার স্বপ্ন গাঁথতে -

অপেক্ষা করো মতিঝিল, শান্তিনগর, অপেক্ষা করো ফেব্রুয়ারীর বইমেলা, আমি ফিরব।”

তাঁর প্রিয় জায়গায় তিনি আবার অবাধে ঘুরে বেড়াতে চান। ভীষণ সংরাগ নিয়ে একথা তিনি উচ্চারণ করেন। স্বভূমিতে ফেরার আনন্দ যে কতখানি হতে পারে তা যিনি বিদেশ-বিভূঁই এ আছেন, তিনিই জানেন। তসলিমা আরো বেশি উপলব্ধি করেন।

তৃতীয় স্তবকে এসে কবিতা এমন এক শিল্পময়তা প্রাপ্ত হয় যে পাঠক তাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এখানকার বর্ণনা আমাদের কালিদাসকে মনে করায়। নির্বাসিত বিরহিত যক্ষ তাঁর প্রিয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে মেঘকে দূত রূপে পাঠান যক্ষপুরীতে। এর সূত্রে আসলে যক্ষেরই এক মানসভ্রমণ হয়ে যায় যক্ষপুরীতে। এখানেও আমরা দেখি নির্বাসিত নাসরিন মেঘকে কঁফোটা বেদনাঘন চোখের জল দিতে চান যাতে মেঘ গিয়ে তাঁর বাড়ির ওপর ঝরতে পারে। তাতেও তাঁর খানিকটা মনের জ্বালা জুড়োয়। পশ্চিমের মেঘের পূর্বদিকে যাওয়ার কথায় বোঝা যায় কবি যখন পশ্চিমের দেশে - দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন শিকড়হীন হয়ে তখনকার বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কবিতায়।

“মেঘ উড়ে যাচ্ছে পশ্চিম পুবে, তাকে কফোঁটা জল দিচ্ছি চোখের

যেন গোল পুকুর পারের বাড়ির টিনের চালে একবার বৃষ্টি হয়ে ঝরে।”

এতই তাঁর আত্মার আরাম। কেননা নিজের দেশে, নিজের ঢোকার যখন কোন অনুমতি নেই, তখন নিজের অপূর্ণ সাধকে যেন ভেসে যাওয়া মেঘের মধ্যে দিয়ে পূরণ করতে চাইছেন। শীতের পরিযায়ী পাখিরাও পশ্চিম থেকে পুবে যাচ্ছে, তারাও যেন তাঁর গ্রামের পুকুরে, দেশের নদীতে, মহাসাগরে একটি করে পালক ফেলে আসে, তাহলে তিনি যেদিন ফিরবেন সেদিন ঐ স্মারকগুলো দেখলে তাঁর মনে হবে পাখিরা তাঁর মনের

টিপ্পনী

বার্তা পৌঁছে দিয়েছে তাঁর ঘরে।

কবিতাটির শেষ স্তবকে তাঁর ফিরে আসার উদগ্র বাসনা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে, শালবন বিহার, মহাস্থান গড়, সীতাকুন্ড পাহাড় পেরিয়ে তাঁর দেশে ফিরবেন, তাঁর, তাঁর ফেরার ইচ্ছের কাছে সব বেদনা হার মেনে যায়। বেঁচে থাকে শুধু ফেরার আর্তি। তাই মানুষ হিসেবে ফিরত না পারলেও, কোন পাখির জন্ম নিয়ে হলেও তিনি ফিরবেন। ফিরবেনই। এযে তাঁরই স্বদেশ জন্মভূমি। শিকড়। তাই এমন কথা, কাব্যের হলেও কাব্য অতিরিক্ত অর্থকে বহন করে নিশ্চয় -

"যদি মানুষ হয়ে না পারি, পাখি হয়েও ফিরব একদিন।"

বাংলা সাহিত্যের খুব কম কবিতাতেই এমন করে ঘরে ফেরার আকুতি আছে। রাষ্ট্রযন্ত্র তাঁর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে, । কিন্তু মনের ওপর কে বেড়ি দেবে। সে কল্পনার ডানায় ভর করে শত সত্তা হয়ে আছড়ে পড়বে দেশের ওপর। যেখানে তাঁর ছোটবেলাকে ফেলে এসেছে, যেখানে তাঁর মা-বাবা মাটিতে মিশে গেছে। তাই বারে বারে জন্ম নিয়েছে তাঁর ঘরে ফেরবার ইচ্ছে। তার জন্য কবির মানুষ হয়ে না জন্মাতে পারলেও ক্ষোভ নেই। এক প্রশান্ত অনুভূতি কাজ করে তার মনে যখনই তিনি ফিরতে চান বাংলা প্রান্তরে, পল্লীতে। তখনই কবিতা হয়ে ওঠে জীবন্ত - বহুমাত্রিক।

প্রশ্নমালা :

১. রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবীর ব্যক্তিজীবনের দুঃখের ওপ্রকাশ কি ভাবে ঘটেছে 'শোকগাথা' কবিতায় - প্রসঙ্গ সহ ব্যাখ্যা করো।

২.কামিনী রায়ের 'প্রণয়ে ব্যথ্যা' কবিতাটি অনেকটা এলিজি ধর্মী হলেও তা রসোত্তীর্ণ কবিতা হয়ে উঠতে পেরেছে - আলোচনা করো।

৩. কবিতা সিংহের 'পরমেশ্বরীকে' কবিতাটিতে নারী মুক্তির কথা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে - ব্যাখ্যা করো।

৪. দেবারতি মিত্রের 'প্রতিচ্ছবি কঁপে ওঠে' কবিতাটি রোমান্টিক হয়েও তা বাস্তবের খুব কাছাকাছি এ কথার সমর্থনে কবিতাটিকে দেখা সঙ্গত কিনা ব্যাখ্যা করো।

৫. ভালোবাসা - ৩, ৪ সংখ্যক কবিতায় নবনীতা দেবসেন ভালোবাসাকে খুঁজেছেন ও বুঝেছেন নিজের শর্তে যুক্তিগ্রাহ আলোচনা করো।

৬.'ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে' কবিতায় কি ভাবে মল্লিকা সেনগুপ্ত পুরুষতান্ত্রিকতার

টিপ্পনী

পরম্পরাকে ব্যঙ্গ করেছেন - আলোচনা করো।

৭. তসলিমা নাসরিনের তবু ফিরব কবিতাটিতে ঘরে ফেরার আকুল আকূতি মর্মস্পর্শ ভাষায় যে ভাবে ব্যক্ত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।

টিপ্পনী

তৃতীয় একক : নির্বাচিত গল্প

পেনেটিতে : লীলা মজুমদার

টিপ্পনী

দীর্ঘ আয়ু নিয়ে জন্মেছিলেন এ পৃথিবীতে। বড় পরিবারেও। ভারতীয় জরিপ বিভাগের কর্মকর্তা আর বিখ্যাত বনের খবরের লেখক প্রমদারঞ্জন তাঁর পিতা। মাতা সুরমা দেবী। তিনি লীলা মজুমদার।বাংলা কথা সাহিত্যের এক জন একনিষ্ঠ স্রষ্ঠা। কলকাতার গড়পাড়া রোড়ে, বিখ্যাত রায় পরিবারে তাঁর জন্ম। ১৯০৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী। প্রমদারঞ্জন রায় উপেন্দ্রকিশোরের দাদা। সেই সূত্রে লীলা সুকুমার রায়ের খুড়তুতো বোন। সত্যয়জিৎ রায়ের পিসি লীলার বাল্যজীবন কাটে শিলঙে। সেখানেই লরেটো কনভেন্ট ১৯১৯ সাল পর্যন্ত পড়াশুনো করেন। লেখালেখির চর্চা তাঁর খুব ছোটবেলা থেকেই ছিল। মাত্র তের বছর বয়সে লেখার হাতে খড়ি হয় 'সন্দেশ' পত্রিকায় । ১৯২২ -এ 'সন্দেশ' এ তাঁর প্রথম গল্প 'লক্ষ্মীছাড়া' প্রকাশিত হয়। ভূতের গল্পে লীলা মজুমদারের জুড়ি মেলা ভার। তিনি রচনা করতেন সব অদ্ভুতুড়ে স্বপ্ন। যে স্বপ্ন কেবল ছোটরাই দেখে। ভীষণ দ্যুতিময় তাঁর গল্প বলার ঢঙ। তাঁর কল্পনা আকাশ ছুঁয়ে যায়। বাংলা সাহিত্যকে তিনি অকাতরে দিয়েছেন। অনেক বেশি পরিমানে দিয়েছেন কিশোর সাহিত্যকে। তাঁদের আদি নিবাস ছিল বাংলাদেশের ময়মনসিংহের মসূয়া গ্রামে। লীলা ছোত থেকেই ডানপিটে। গাছে চড়া, পাহাড় বাওয়া, অবাধ্যতা, মারামরি, ঝগড়া আর জেদের কমতি ছিলনা তাঁর জীবনে। জীবনের এই দস্যিপনা গুলোই তার হাতে লেখা হয়ে রূপ পেয়েছে পরবর্তীতে।

এবার একটু তাঁর পড়াশুনোর কথায় আসা যাক। ছোটবেলা থেকেই লীলা মেধাবী। বড়বেলাতেও তা সমান ভাবে বজায় থেকেছে। বি.এ. ও এম. এ. দুই পরীক্ষাতেই তিনি ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। কর্মজীবনও বর্ণময়। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে পড়াতে আসেন শান্তিনিকেতনে। এছাড়া তিনি পড়িয়েছেন আশুতোষ কলেজে। আকাশবাণীতে প্রয়োজক হিসেবেও চাকরী করেন অনেক দিন। তবে লেখা থামেনি।তাঁর লেখার মধ্যে জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর প্রভাব পড়েছিল। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। 'পদী পিসির বর্মী

বাক্স', 'পাকদন্ডী', 'টং লিং', 'নতুন ছেলে নটবর', 'সব ভূতুড়ে', 'আর কোনখানে', 'খেরোর কাতা', 'বদ্যিনাথের বাড়ি', 'দিন দুপুরে', 'বাতাস বাড়ি', কিশোর সাথী', 'হলদে পাখির পালক' ইত্যাদি। 'পাকদন্ডী' দাঁর আত্মজীবননীমূলক রচনা। এছাড়া শিক্ষামূলক রচনা ও রম্যরচনা ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি বহু পুরস্কারে ভূষিত হন। রবীন্দ্র পুরস্কার, সঙ্গীত নাটক একাডেমী পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার, ভারতীয় শিশু সাহিত্যের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। এছাড়া ১৯৬১ তে সত্যজিৎ রায় 'সন্দেশ' পত্রিকাকে পুণর্জীবিত করলে লীলা মজুমদার ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত সাম্মানিক সহসম্পাদক হিসেবে এর সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৯৪ এ স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে অবসর নেন।তাঁর সাহিত্য-জীবন প্রায় আট দশকের।

টিপ্পনী

তাঁর বৈবাহিক জীবন ছিল খুবই সুখের।যদিও পিতার প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি তাঁর স্বনির্বাচিত পাত্র দন্ত চিকিৎসক ডাক্তার সুধীর কুমার মজুমদারকে বিয়ে করেন ১৯৩৩ সালে। এই কারণেই তাঁর পিতার সঙ্গে চিরকালের জন্য তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তবে স্বামী আজীবন লীলার সাহিত্যকর্মের উৎসাহ ছিলেন। তাঁদের এক পুত্র ডা. রঞ্জন মজুমদার এবং এক কন্যা কমলা চট্টোপাধ্যায়। সুখী সংসার দীর্ঘায়ু এই মহান শ্রষ্টা অমৃতলোকে যাত্রা করেন ২০০৭ সালের ৫-এপ্রিল।

এবার সরাসরি আসা যাক 'পেনেটিতে' গল্পটির প্রসঙ্গে। এটি কিশোর রচনা। ছোটোদের বড় লেখক লীলা মজুমদার তা এই গল্পটি পড়লে প্রমাণিত হয়। তাঁর লেখা ভীষণ দ্যুতিময়। কোন গম্ভীর বিষয় বা কঠিন বিষয় তাঁর লেখার বাহন নয়। অতি সহজ বিষয়, ততোধিক সহজ বলার ধরন। কিন্তু খুণ আকর্ষনীয়, গতিময়। গল্পের মধ্যে থাকে টান টান উত্তেজন। ভূতের গল্প লেখায় তার জুই মেলা ভার। তাঁর হাতে ভূতের গল্প হয়ে ওঠে। যেমন ভাবে গাছে ফুল ফোটে, আকাশে মেঘ ভাসে, হাওয়া বয়, তেমনি তাঁর লেখনি। যেন এমনটাই হবার কথা ছিল। তবে তা আগে বোঝা যায় না। গল্প পড়ার পর মনে হয় এমন ভাবে ছাড়া অন্য কোন ভাবে যেন শেষই হতে পারতো না গল্পটি।

'পেনেটিতে' গল্পটি শুরু হয় খুব সহজাত বলার ঢঙে। যেন সামনে আমাদেদর পাঠকদের বসিয়ে রেখে লেখক গল্প বলতে শুরু করেছেন। গল্পো বলার আসরটি আগে তিনি তৈরী করে নিয়েছেন শুরুতেই।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

গল্পের কথক গুপের মুখ দিবে সমগ্র গল্পটি বর্ণিত হয়েছে। গুপের বয়স তখন ১৪ - ১৫, আন্দাজ করা যায়। সে তখন ক্লাস নাইনের ছাত্র। গুপের বড়ো মামা একটা পুরনো

বাড়ি কিনেছিল হঠাৎ করেই। পেনেটিতে, গঙ্গার ধারে। বড়ো মামা বাড়িটি সস্তায় পেয়েছিল কেননা বাড়িটিতে নাকি ভূতের উপদ্রব ছিল। অকৃতদার বলে বড়োমামাকে বোঝানোর কেউ ছিল না এই বাড়ি কেনার ব্যাপারে। গুপের মেজো মাসিমার মৃদু আপত্তি ছিল বলেছিল -

" নাই -বা কিনলে দাদা, কিছু নিশ্চয়ই আছে, নইলে কেউ থাকে না কেন ?"

বোনের এই আপত্তিকে ভুল প্রমাণ করবার জন্য, কেনার আগে দুজন ষন্ডামার্কা পালোয়ানকে মুরগির মাংস খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে দু'রাত রেখেছিল সেখানে। ঐ ষন্ডাদের সবকথা অবশ্য ভেঙে বলা হয়নি। পরে যখন তারা শুনলো সব বৃত্তান্ত, তখন বেজায় চটে গিয়েছিল তার। পালোয়ানরা বলেছিল -

"যদি কিছু হত দাদা ? গায়ের জোর দিয়ে তো ওনাদের সঙ্গে পেরে ওঠা যেত না !"

এখানেই লেখকের মুন্সিয়ানা। চরিত্রগুলিকে এত স্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যা সত্যিই জাত লেখকের ধর্মকে চিনিয়ে দেয়। পালোয়ানদের সম্পর্কে সমাজের ভাবনাকেই তুলে ধরেছেন লেখক। পালোয়ানেরা শরীরের চর্চা করে। মগজের নয়। চেহারাটি তাদের ষন্ডামার্কা হলে হবে কি আসলে তারা ভীতু। এবং সংস্কারাচ্ছন্নও বটে। তাই তারা ভূতেদের 'ওনারা' বলে সম্বোধন করেছে। নামটি পর্যন্ত যেন মুখে আনা মানা।

বড়োমামা দমে যাবার মানুষই নন। তিনি বাড়িটি কেনার দুমাস পর থেকে সেখানে 'রেগুলার' বসবাস শুরু করে দিলেন। সঙ্গে গোটা তিনেক মানুষ তারাও বিচিত্র চরিত্রের অধিকারী। প্রথম জন বঙ্কু ঠাকুর। রান্নার হাতটিই তার পরিচয়। তার রান্নার হাত এতোই চমৎকার যে, 'যে একবার খেয়েছে সে জীবনে ভোলেনি;'। দ্বিতীয়জন হ'ল নটবর বেয়ারা, তার বুকের ছাতি চুয়াল্লিশ ইঞ্চি। রোজ সকালে-বিকেলে আধঘন্টা করে দুটো আধমনি মুগুর ভাঁজে। তৃতীয় ব্যক্তি ঝগড়ু জমাদার। 'গুন্ডামি-টুন্ডামির জন্য' বার চার পাঁচেক জেল খেটে এসেছে। বড়োমামা এদের নিজের বাড়িতে রাখার কারণ যেমন এই সমস্ত গুনোপনা তেমনি এরা কেউই - "ভূত কেন, ভগবানেও বিশ্বাস করে না।"

লীলা মজুমদার জানেন গল্প বলতে গেলে চরিত্রগুলোকে যেমন সত্য করে গড়ে তুলতে হয়, তেমনি সহজ; মুখের ভাষার ব্যবহার করতে হয়। তাই তিনি গল্প বলতে

টিপ্পনী

বলতে সহজেই প্রচলিত বাংলা ব্যবহার করেছেন। সেই জন্যই এসে পড়েছে - 'রেগুলার', 'বুকের ছাতি', 'আধমনি', গুন্ডামি-টুন্ডামি' প্রভৃতি শব্দবন্ধ। এই শব্দগুলি গল্পকে গতি দিয়েছে আবার চরিত্রগুলিকেও বাস্তবিক করেছে।

গুপের কথাতে জানা যায় ওরা আগে বরানগর ছিল। ওর বাবা পাটনা বদলি হয়ে যাওয়ার সময় মামার কাছে ছেলেকে পাঠিয়ে দেয় গুপের বাবা। গুপের কথায় আরো একটি বিষয় জানা যায়, তা হ'ল বড়োমামার কবিতা লেখার সখ আছে। কবিতা লিখে তিনি শোনানোর লোক পান না। বঙ্কুদের শোনান। কিন্তু বঙ্কুরা তা শুনতেই চায় না। এ আক্ষেপ বড় মামার আছে। গুপে আসবে শুনে বড়ো মামা তাই খুব উৎসাহিত হয়ে বলেন -

> "..... আমিও আমার নতুন কবিতাগুলো শোনাবার লোক পাব, বঙ্কুরা তো আজকাল আর শুনতে চায় না। ভালোই হল।"

লেখক এক কথায়, খুবই অল্পো শব্দে সখের কবিদের চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন। এত অল্প কথায় যথাযথ চরিত্র অঙ্কন সত্যিকারের বড় লেখকের শৈলী। শুধু বড়দের চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য অঙ্কনেই থেমে থাকেন নি লেখক। এবারে তিনি আঁকলেন কিশোরদের চরিত্র। উঠে এল তাদের দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, অভিমানের কথা। লেখক লিখেছেন -

> "মনটা তেমন ভালো ছিল না, মা-রাও চলে গেছেন আবার আমাদের ক্লাসের জগু আর ভুটে বলে দুই কাপ্তেন কিছুদিন থেকে এমনি বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল যে, স্কুলে টেকা দায় হয়ে উঠছিল। আগে ওরাই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল, কিন্তু পুজোর ছুটির সময় সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে ওরা এমন পা-এ আকারা ছোটলোকের মতো ব্যবহার আরম্ভ করেছিল যে, ওদের সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। এখন ওরাই হলেন ফুটবলের ক্যাপ্টেন, ক্লাবের সেক্রেটারি। সে দিনও ওদের সঙ্গে বেশ একতা কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে; সে আবার অঙ্ক ক্লাসে। আমার একার দোষ নয়, কিন্তু ধরা পড়ে বকুনি খেলাম আমিই। ওরা দেখলাম খাতার আড়ালে ফ্যাচ ফ্যাচ করে হাসছে।"

কিশোর মনস্তত্ত্ব লেখকের হাতে ভারি চমৎকার ভঙ্গিতে লিখিত হয়েছে। এরপর থেকে গল্প চূড়ান্ত পরিণতির দিকে বাঁক নেয়।

টিপ্পনী

গুপের মন ভালো নেই। স্কুলের ঘটনাগুলো তাকে বিষন্ন করে রেখেছিল। যাইহোক খাওয়া দাওয়া সেরে গুপো দোতলার ঘরে যায়। ঘরের সামনে চওড়া বারান্দা থেকে সে দেখতে পায় -

> "বাগানময় ঝোপঝাড়; আমগাছ, কাঁঠাল গাছও গোটাকতক আছে। গঙ্গার ধার দিয়ে জবা ফুলের গাছ দিয়ে আড়াল করা একটা সরু রাস্তা একেবারে নদীর কিনারা ঘেঁষে চলে গেছে।"

গুপে সেখানেই দেখতে পায় তিনজন মাঝি গোছের লোক মাছ ধরার ছিপ সারাচ্ছে। একজন বুড়ো। আর দুজন গুপের একটু বড়। ওরা গুপেকে দেখতে পেয়ে নিজে থেকেই ডেকে আলাপ করল। দেখতে দেখতে বেশ ভাব জমে গেল। বুড়োর নাম শিবু। ছেলে দুটো ওর ভাইপো - সিজি আর গুজি। এই লোকগুলো সম্পর্কে লেখক লিখেছেন -

> "বেশ লোকগুলো। বাড়ীর মধ্যে আসত - টাসত না, চাকরবাকরদের এড়িয়ে চলত, কিন্তু আমার সঙ্গে খুব দহরম - মহরম হয়ে গেল।"

এর পরই আবার লেখক বর্ণনা করেছেন -

> "মামা মাঝে মাঝে খুব রাত করে বাড়ি ফিরত। আর দোতলায় একা একা আমি তো ভয়ে কাঠ হয়ে শুয়ে থাকতাম। শিবুদের কাছে সেকথা জানাতেই, যে দিনই মামা বেরোতেন, সে দিনই ওরা জলের পাইপ বেয়ে উপরে উঠে, বারান্দায় বসে আমার সঙ্গে কত যে গল্প করত তার ঠিক নেই।"

একটু একটু করে লেখক গল্পের মধ্যে রহস্যের জাল বুনে বুনে যাচ্ছেন। নতুন নতুন লোকেদের সাথে গুপের আলাপ তারপর খুব ভাব হয়ে যাওয়া। গুপের নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য দোতলার ঘরে পাইপ বেয়ে উঠে পড়া - এসবই কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হয়।

ওদিকে স্কুলের ঝগড়া বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে গেল যে, ওই জগু, ভুটে আর ওদের শাকরেদ নেলেকে আচ্ছ করে শিক্ষা না দিলেই নয়। এই নিয়ে শিবুদের সঙ্গে আলোচনা হল এক প্রস্থ। আলোচনায় উঠে এল যে ওদের এই বাড়িতে ডেকে এনে ভূতের ভয় দেখাতে হবে। পরিকল্পনা সব গুপেই করল। গুপে বলল -

> "দেখ্, তোদের তিন জনকে কিন্তু ভূত সাজতে হবে আর আমি ওদের

টিপ্পনী

ভুলিয়ে ভালিয়ে আনব। তোদের সব সাজিয়ে গুজিয়ে দেব।"

এই শুনে ওরা বলে -

"অ্যাঁ ! সেজিয়ে-গুজিয়ে দেবেন কেন বাবু ? রং টং মেখিয়ে দেবার দরকার হবে না। তিনটে চাদর দেবেন। আমরা সাদা চাদর গায়ে জড়িয়ে, গঙ্গার ধারে ঝোপের মধ্যে এমনি এমনি করে হাত লাড়তে থাকব আর ওঁ ওঁ শব্দ করব, দেখবেন ওনাদের পিলে চমকে যাবে।"

সেই মতোই কাজ এগোলো। স্কুলে গিয়ে গুপে কথার জালে জড়িয়ে বাড়ি নিয়ে আসে জগু, ভুটেদের। বড়োমামা সন্ধ্যায় বেরোলেন। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে সবাই বাগানে এল। লেখক বলেছেন -

"চারিদিকে অন্ধকার হয়ে এসেছে। একটু একটু চাঁদের আলোতে সব যেন কীরকম ছায়া দেখাচ্ছে।"

গল্প করতে করতে গুপে গঙ্গার ধারের সরু রাস্তায় নিয়ে এল ওদের। বাড়ি থেকে এ জায়গাটা দেখা যায় না। এখানে এসে গুপেরও একটু ভয় করছিল। "ঝোপের পাশে তিনটে সাদা মূর্তি ! মাথা মুখ হাত সব ঢাকা, আবার হাত তুলে তুলে যেন ডাকছে আর অদ্ভুত একটা ওঁ ওঁ শব্দ !" এসব দেখে গুপের আবার হাসিও পাচ্ছিল একটু এধটু।

এসব কান্ড দেখে জগুরা 'এক মিনিটের জন্য সাদা হয়ে গিয়েছিল'। মুহূর্তে ওরা বুঝতে পারল ওদের সাথে মজা করা হচ্ছে। তক্ষুনি 'তবে রে হতভাগা ! চালাকি করবার জায়গা পাসনি !' বলে ছুটে গিয়ে চাদরসুদ্ধ মূর্তিগুলোকে জাপটে ধরল। ছোঁবামাত্র মূর্তিগুলো যেন ঝুর ঝুর করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। শুধু চাদর তিনটে মাটিতে পড়ে গেল। এই না দেখে 'জগু, ভুতে নেলোও তক্ষুনি মূর্ছা গেল। গুপে পাগলের মতো ডাকতে লাগল শিবু, সিজি ও গুজিকে। চিৎকার শুনে বঙ্কু, নটবর আর ঝগড়ু হুল্লা করতে করতে এসে জগুদের তুলে ঘরে নিয়ে গিয়ে, চোখে মুখে জল দিল। গুপের গায়েও এক বালতি দিল ঢেলে। মামাকে পাড়া থেকে ডেকে আনা হল। মামা খুব রেগে গিয়ে গুপেকে বকতে লাগল। এদিকে শিবু-সিজি-গুজির কথা কেউ কখনো শোনেনি। তাদের কথা কেউ বিশ্বাসই করল না। তাদের খুঁজে আনতে বলা হল গুপেকে। গুপে আপন মনে বলে চলে -

"কিন্তু তাদের কি আর কখনো খুঁজে পাওয়া যায় ? তারা তো আমার চোখের সামনে ঝুরঝুর করে কর্পূরের মতো উবে গেছে।"

টিপ্পনী

গুপের গল্প বলা এখানেই শেষ হয়। আসল শিবুরাই ছিল ঐ বহুচর্চিত ভূত। তবে লীলা মজুমদারের গল্পের ভুতেরা মানুষেরই মতো। তারা মানুষের বন্ধু। ভয় দেখানো, বা মানুষের জীবননাশের মতো কোন কাজ তারা করে না। তাঁর ভূতের গল্প রসালো। চমকপ্রদ। কখনোই তা গা ছমছমে নয়। এগল্পটিও শেষ হয় তেমনভাবে। আর একটা দিক হল গল্প শেষ হওয়ার পর কিছু প্রশ্ন না ধাকলে সে গল্প কিসের সার্থক ! এ গল্পের শেষেও কিছূ প্রশ্ন থাকে। বঙ্কু, নটবররা কি আর থাকলো এ ঘটনার পর এ বাড়িতে ? জগু, ভুটেদের কি অবস্থা ? সর্বোপরি মামা এবার কি পদক্ষেপ নেবেন। জানার এ আক্ষেপ থেকে যাবে পাঠকের।

টিপ্পনী

এ গল্পের কোথাও লীলা মজুমদার নির্দিষ্ট করে বলে দেন না যে কারা ভুত। কিন্তু পাঠ শেষে খুবই স্পষ্ট হয়ে যায় যে কারা ভূত। এতক্ষণ ধরে তাদের কি কর্মকান্ড ছিল গল্পে। পাঠ শেষে পাঠক মেলাতে শুরু করেন নতুন করে। কোথায় কোথায় গল্পকার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। শেষে এসেই বোঝা যায় যে ঐ ইঙ্গিতগুলো এত স্বাভাবিক ছিল যে, তা পাঠকের কল্পনাতেও আসে নি যে এরা ভূত।

গল্পের প্রধান চরিত্র গুপেও খুবই সপ্রতিভ। স্বাভাবিক। সে ইন্দ্রনাথের মত অমিত সাহসীও নয়, আবার শ্রীকান্তর মত খুব ভীতুও নয়। কিশোর চরিত্র হিসেবে লীলার গুপে স্বাভাবিচক চরিত্র। তার মনস্তত্ত্ব সুঅঙ্কিত গল্পে। আর পেনেটি নামক জায়গায় সমগ্র ঘটনাটি ঘটে তাই নাম তো 'পেনেটিতে'ই হবে। কারণ এটি ঘটনা প্রধান গল্প। তবে ঘটনার ঘনঘটা নেই। গল্পে আছে সরলরৈখিক বিস্তার। একমুখীতা। যা যা একটি ছোটগল্পকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তার সবই এ গল্পে বিদ্যমান। একেবারে শেষে আছে Climax বা 'চূড়ান্ত বিন্দু'। এ ধরনের রহস্য গল্পে এমনই হওয়া উচিত। সব মিলিয়ে 'পেনেটিতে' গল্পটি সুন্দর একটি কিশোর গল্প। বড়দের ও আনন্দ দেয়।

তিমির সম্ভবা : জ্যোতির্ময়ী দেবী

জ্যোতির্ময়ী দেবীর ১৮৯৪ সালে রাজপুতানার জয়পুর শহরে। তাঁর দাদু সংসারচন্দ্র সেন জয়পুরের মহারাজার দেওয়ান ছিলেন। জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখায় সব সময়ই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। তা নারী স্বাধীনতার কথা বলে বলে সচেতনতার কধা। তাঁর জীবন সংগ্রাম থেকেই জন্ম নেয় তাঁর নারীবাদী চেতনা, যা হয়ে ওঠে তাঁর রচনার মূল উপাদান। তাঁর লেখনীই ছিল তাঁর জীবনের হাতিয়ার। মাত্র দশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় হুগলীতে। পঁচিশ বছর বয়সে ছটি ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি ফিরে যান পিতৃগৃহে।

তারপর শুরু হয় তাঁর আত্মসমীক্ষা এবং স্বতন্ত্র প্রকাশভঙ্গির সাধনা। তিনি তাঁর লেখায় নিজের মতো করে প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টা করেন মেয়েদের সংগ্রাম শুধু আত্মপরিচয়ের নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠার ও।

জ্যোতির্ময়ী দেবী স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজীর অনুগামী, সর্বভারতীয় মহিলা সঙ্ঘের (AIWC) সহসভানেত্রী, দীর্ঘ ৬৮ বছর ধরে হিন্দু 'শুদ্ধান্তঃপুরের' নিষ্ঠাবতী বিধবা এই স্নেহময়ী সেবাব্রতী শীর্ণাঙ্গী মহিলা লেখার মাধ্যমে সমাজের সঙ্গে এক অসম সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। অকালবৈধব্য যখন তাঁকে ঠেলে দিলো হিন্দু যৌথ পরিবারের প্রান্ত প্রদেশে তখন তিনি লক্ষ করলেন মনজগতে এক ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা। এটাও বুঝলেন এ নিঃসঙ্গতা তাঁর একার নয়। অনেক মেয়ের। অকাল বৈধব্যের নিঃসঙ্গতা থেকে জন্ম নিলো তাঁর লেখক সত্তা। তাঁর কথা এমনই ছিল -

> "এ যে কি ধরণের বিপর্যয়, মনে জীবনে সংসার যাত্রায়, তা বলে বোঝানো এত দিন পরেও শক্ত।
>
> এবং এ বিপর্যয় শুধু মেয়েদের জীবনেই আসে। পুরুষের জীবনে এমনটা হয় না।
>
> এটাও আমার নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি।.....
>
> আমি এক নিমেষে যেন মনের একটি প্রান্তরে এসে দাঁড়ালাম। সেখানে কেউ কোথাও নেই যেন।"

অকালবৈধব্যের নিঃসঙ্গতায় তাঁর নজর পড়ে 'সমাজ' -এর প্রতি -

> "তাই অত দুঃখের মাঝেও মনে হয়েছিল সেদিন, এ যেন মানুষের জীবন নিয়ে বিধাতার লীলার সঙ্গে সমাজেরও একটা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ বা কৌতুক। যার বিধি নিষেধের অন্ত নেই মেয়েদের ক্ষেত্রে। সমাজের যন্ত্র যেন, মানুষ নয়।"

এই যন্ত্রের সঙ্গে লড়াই করে জন্ম নিলেন লেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবী। শুধুমাত্র সমাজের অবিচার সম্পর্কে ব্যক্তিগত ক্ষোভ জানিয়েই তো লেখিকা হওয়া যায় না, তালিম নিতে হয় পূর্বসুরিদের কাছে।

> "বারে বারে পড়লাম, পেলাম বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ কথামৃত, রবীন্দ্রকাব্য ও কথাসাহিত্য।"

টিপ্পনী

আরো তিনি পড়লেন -

> "আর পড়লাম সঙ্গে মানকুমারী, কামিনী রায়, প্রিয়ম্বদার কাব্যকবিতা এবং স্বর্ণকুমারী, ক্রমে অনুরূপা নিরুপমা সীতা শান্তাদেবীদের লেখা কথাসাহিত্য।"

২৮ - ২৯ বছর বয়সের 'বৌ মানুষ' জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখা 'নারীর কথা' বেরোল ১৩২৮ বঙ্গাব্দের আষাড় মাসের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখায় উঠে এসেছে সমাজের দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া মানুষের কথা। উঠে এসেছে বাঙালি মধ্যবিত্ত মেয়েদের স্বনির্ভর হওয়ার প্রচেষ্টার কথা। বাঙালি হিন্দুসমাজের প্রত্যন্ত-প্রদেশে থাকে যে অসংখ্য নারী, বারাণসীর হিন্দু বিধবা, অথবা পতিতালয়ের বেশ্যা, রাজস্থানের নির্যাতিতা নারী, হরিজন সম্প্রদায়, সংরক্ষণে ভাঁওতা দিয়ে যেখানে দারিদ্র্যের প্রতি অবমাননা করা হয় তাঁদের কথা উঠে এসেছে। কথাসাহিত্য এবং ব্যক্তিগত ভ্রমণকাহিনী মিলিয়ে উত্তর ভারতের অনেকখানিই ফুটে উঠেছে জ্যোতির্ময়ী দেবীর কলমে। সতীনাথ ভাদুড়ীর মতো তিনিও ভাঙ্গীদের কথা লিখেছেন। দেশবিভাগের ট্র্যাজেডি, পাঞ্জাবে এবং বাংলাদেশে দেশভাগের যে মানসিক ক্ষয়ক্ষতি, প্রধানত মেয়েদের চোখ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসগুলিতে নায়ক নায়িকারা সামাজিক অবমাননার গ্লানি কাটিয়ে উঠতে চলে যায় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে। মেয়েদের স্বনির্ভরতার চেষ্টা তাঁর উপন্যাসের ও বড় গল্পের একটি প্রধান উপজীব্য বিষয়।

বাংলা সাহিত্যের প্রায় সবকটি ধারায় ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ কবিতা - সবই লিখেছেন অনায়াস দক্ষতায়। কিন্তু দুঃখের কথা আত্মবিস্মৃত বাঙালি জ্যোতির্ময়ী দেবীকে নিয়ে আর বিশেষ চর্চা করেন না। যশ এবং খ্যাতির মুখ চেয়ে তিনি কলম ধরেননি। তাঁর সীমিত স্বীকৃতিতে কোনও ক্ষোভ ছিল না। ১৯৬৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিত করে ভুবনমোহিনী পুরস্কারে। ১৯৭১ - ৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদান করেন রবীন্দ্র পুরস্কার তাঁর 'সোনা রূপা নয়' গল্প গ্রন্থের জন্য। তাঁর রাজপুতানার গল্পগলো রাজশেখর বসুর প্রশংসা লাভ করে। এই যশস্বী লেখিকা ৯৪ বছর বয়সে ১৯৮৮ সালে মারা যান।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখার প্রবণতা নিয়ে ইতিমধ্যেই খানিকটা আন্দাজ পাওয়া গেছে। আমাদের পাঠ্য 'তিমির সম্ভবা' গল্পটিও সেই ধারারই। এ গল্পটিও একটি মেয়ের

টিপ্পনী

একাকী মেয়ের আত্মপ্রতিষ্ঠার গল্প। টিকে থাকার গল্প। নাম -গোত্রহীন মেয়ের লড়াইয়ের গল্প। গল্পটির প্রথমগুণ হ'ল পাঠকালে অন্যকোন দিকে পাঠক সরে যেতে পারে না। শেষ না হওয়া পর্যন্ত। ছোটগল্পের সার্থকতা নিয়ে গল্পটি হাজির পাঠকের দরবারে।

টিপ্পনী

একটি মেয়ে বি.টি. কলেজে পড়তে আসে। সে সবার চাইতে আলাদা। ব্যক্তিত্বে পোষাকে, পড়াশুনোয়। এমন কি নামে। সে ভর্তির সারিতে একেবারে পেছনে। সে কারণেই অনেকের বোধহয় চোখ পড়ছিল তার দিকে। 'তাদের মনে হলো একেবারেই অচেনা মেয়ে। যেন মফস্বলের কলেজের পাশ করা মেয়ে। চেহারা ভালো। একটু লম্বা। দুটি চোখ খুবই কালো। মুখটা হাসি খুশি নয়। গভীর। এমন কি তার কাপড় পরার ধরনটাও আলাদা। সোজাসুজি ঘরোয়া ভাবের। ঠোঁট দুখানা পাতলা। এমনই বর্ণনা আছে। গল্পে তার সম্পর্কে। সে ভর্তি হবার সময় পাশের ছেলেটি চোখের উঁকিতে নামটা সইয়ের সময় দেখে নিলো। এ. মনিকা দাস। হ্যাঁ এই হচ্ছে তার নাম। যথারীতি কলেজ শুরু হল। মণিকা দাস সবার ও সাথে সহজ হয় না। একটু আলাদা থাকে। কোন হালকা গোছের কথা বলে না। সে খুব নিয়মনিষ্ট। ঠিক সময়ে ক্লাসে ঢোকে, ক্লাস নোট নেওয়া ইত্যাদি। সবারই প্রায় কৌতূহল মণিকাকে নিয়ে। আড়ালে আব্ডালে তাকে নিয়ে তার নাম নিয়ে চর্চা করে সবাই। কেউ কেউ বলে -

> "আবার জানিস 'শীকর গুপ্ত বলছিল ওর নামে নাকি একটি 'এ' আছে। এ. মণিকা দাস নামটি।"

সীতা গুপ্ত নামের এক ছাত্রী বলে -

> "দেশী খৃস্টান জানিস ? আমি তো ওদের স্কুলে পড়েছি, এইরকম ধরনের কাপড়ই ওঁরা পরেন, সব মিস্রা।"

কিন্তু অন্তঃশীলা কৌতূহল বেড়েই চলে। শিপ্রা চৌধুরী বলে -

> "আশ্চর্য, দেখেছিস এক মনে নোট নেয়, কারুকে কিছু জিজ্ঞেসও করে না। প্রফেসারদেরও না। খুব চাপা মেয়ে কিন্তু।"

এদিকে মণিকাকে নিয়ে যেমন কৌতূহল বাড়ে সকলের তেমনি গায়ে পড়ে কথাও বলতে চায় তার সাথে। সবাই জানতে চায় মণিকার ঠিকানা। তার সম্বন্ধে সব কিছু। কিন্তু মণিকা যেন সকলের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তাকে প্রশ্ন করলে সে উত্তর দেয়। পরিমিত। তাতে সকলের আরো আগ্রহ বেড়ে যায় মণিকাকে নিয়ে।

কলেজের পরীক্ষা এগিয়ে আসে। শীকর গুপ্তও একটু এগিয়ে আসে। একটু

কাছে আসতে চায় মণিকার। একদিন সুযোগও এসে যায়। স্কুল পরিদর্শনে যেতে হয় সব ছাত্র - ছাত্রীদের নভেম্বরের শেষ তখন। হঠাৎ বৃষ্টি আসে। ট্রাম থেকে নামবার আগেই বৃষ্টি নামে অজস্র ধারায়। ছাতা আনে নি মণিকা। কিন্তু নামতে তো হবেই। 'সে্ নামল বৃষ্টির সঙ্গে। সহসা শীকর গুপ্ত ছাতা নিয়ে এসে বলে -

"ভিজে যাবেন, চলে আসুন ঐ গাছটার তলায় একটু দাঁড়াই। একটু বৃষ্টি ধরলে কলেজে ঢুকবো।"

এভাবে শীকর গুপ্ত কাছে এল মণিকার। টুকটাক কথা হয়। সামান্য উত্তর দেয় মণিকা। কিন্তু তাতে শীকর গুপ্তর মন ভরে না।

দেখতে দেখতে পরীক্ষা শেষ হয়। কলেজে জোর গুজব শোনা যায় মণিকার 'পেপার' খুব ভালো হয়েছে। শীকর জানতে চায় মণিকা এবার কোথায় যাবে। দেখা হলে ভালো হয় - এমনও ইচ্ছে পোষন করে শীকর। জুলাই মাসে। পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। দেখা যায় মণিকা তৃতীয় স্থান পেয়েছে ফার্ষ্ট ডিভিশনে। শীকর দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছে। অভিনন্দন জানাতে থাকে সকলে মণিকাকে। শীকর এবার মণিকাকে ঘুরতে যাবার প্রস্তাব দেয়। মণিকা একটু ইতস্তত করে একটা দোতলা বাসের উপরের সিটে গিয়ে বসে। পাশাপাশি বসে ওরা। কিন্তু দুজনেই নির্বাক। শুধুই অকারণ ঘোরা হল। এক সময় ধর্মতলার মোড় এসে পড়ে বাস। মণিকা নামতে চায়। শীকর চকিত হয়ে মণিকার ঠিকানা জানতে চায়। মণিকা জানায় যে সে লুধিয়ানায় একটি কাজ পেয়েছে সেখানে গিয়ে চিঠি দেবে ঠিকানা লিখে। সহসা শীকর মণিকার হাত ধরে বলে -

"আপনি আমার মনের কথা কি বুঝতে পারছেন না ? আর এম. এ. পড়বেন না ? একেবারে দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন ?"

মনিকা জানায় সে চাকরী করবে। শীকরের অনুরোধে বাস থেকে নেমে তারা ময়দানে বসে। মণিকার হাত ধরে শীকর এবার সরাসরি বলে -

"আমার আপনাকে ভালো লেগেছে এই কথাটিই আজ জানাবার ছিল। আর পরিচয়টা এখানেই শেষ না হয়ে যাক, এই ই বলতে চাই।"

মণিকা কিছু বলে না। শীকর মণিকার কথা জানতে চায়। মণিকা বলে তার পরিচয়, ঠিকানা কাল সব চিঠিতে জানাবে।

শীকর এবার খুব উদারপন্থীর মতো বলে ওঠেন -

টিপ্পনী

"পরিচয় চাইছি বটে। কিন্তু জাত গোত্র কুল পরিচয়ের চেয়ে কি মানুষ পরিচয়ই আরও বড় পরিচয় নয় ?"

এর উত্তরে মণিকা শুধু বলে -

"আমি জানি না। বলা শক্ত। মানুষকে কি মানুষ চিনে নিতে জানে ? নেয় ?"

টিপ্পনী

কথামতো পরদিন মণিকা শীকর গুপ্তকে চিঠি লিখে জানায় যে তার কোনো পরিচয় নেই। সমাজের অন্ধকার জগতের একটি মেয়ে সে। তার বাবা-মা'র পরিচয়ও সে জানে না। তার মা আসন্ন প্রসবা হয়ে খুব বিপদে পড়ে আশ্রয় নেয় তাঁর ছোটবেলায় পড়া মিশন স্কুলের কর্ত্রী এক মেমসাহেবের কাছে। তার জন্মের পর সে মাও মারা যান। মেমসাহেবেই তার নাম দিয়েছিলেন নিজের নামে। 'অ্যান' মনিকা দাস। মনিকা আরও লেখেন -

"আপনার অনুক্ত কথা আমার মনের কোণে পৌছোয়নি তা নয়। আমি জীবনে যা পাইনি, পাবার কথা ভাবিনি, আশা করব সাহসও করিনি, নিজের জীবনের কথা জেনে সেই শ্রদ্ধা ভালোবাসার লোভ, গৃহহীন জীবনে ঘরের লোভ, সেও তো মানুষের কাছে কম নয়, মেয়েদের কাছে বিশেষ করে। কিন্তু পরিচয়হীন জীবনের দাম আমি দেখেছি। আমি সেই মোহকে প্রশ্রয় দিইনি। আপনি জানেন তা আমার জাত, ধর্ম, কূল, বংশ-পরিচয় কিছু জানি না। হিন্দুর মেয়েই ছিলাম বলে মনে হয়।"

এ চিঠি শীকর পাঞ্জাব মেল ছাড়ার আগেই পেল। কিন্তু শীকর সহসা যেন পাথর হয়ে গেল। এদিকে মণিকা আশা না করেও আশা করতে থাকল শীকরের চিঠির। বছর অতিক্রান্ত কিন্তু কোন উত্তর আসে না। বহুদিন পর একদিন অমৃতসর স্টেশনের বুক স্টলে সামান্য পরিচিত এক শিখ যুবক ও মণিকা বই ঘাঁটছিল। এমন সময় শীকর গুপ্ত তার স্ত্রীকে নিয়ে এসে হাজির। গর্বিত মুখে জানায় যে তারা হানিমুনে যাচ্ছে কাশ্মীর। তার স্ত্রী প্রেসিডেন্সি কলেজের নাম করা ছাত্রী ছিল। তা জানাতে ভোলে না শীকর। কথায় কথায় সে আরো জানায় সে বিলেত ফেরত। বড় কাজ করে। মাস্টারিতেই সে বসে নেই। মণীকা এবার বলে -

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

"ইনি মিলিটারি অফিসার সর্দার অর্জুন সিং। এঁর সঙ্গেই নতুন

জীবনযাত্রা শুরু হবে আমার ঠিক রয়েছে।"

এই শুনে শীকর গুপ্ত কেমন চমকে ওঠে। তারপর তড়িঘড়ি চলে যায় ট্রেনের দিকে।

মণিকা শীকরের দম্ভ সহ্য করতে না পেরে অর্জুন সিংহের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা বলতে বাধ্য হয়, তা সে সর্দারকে জানায় এর জন্য মার্জনা চেয়ে নেয়। বাইরে এসে সর্দারকে নিজের জীবনের সব কথা বলে। সর্দার তখন বলে -

> "কোনদিন যদি আমার কিছু বলবার থাকে তো সে দিন আপনি একটু শুনবেন । এমনও হতে পারে আজকের এই সন্ধ্যা আজকেই একেবারেই শেষ হয়ে যাবে না।"

এই বলে মণিকাকে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নেয়। গল্পটি শেষ হয়।

এই মণিকাদের কথাই জ্যোতির্ময়ী দেবী বলেছেন বারংবার তাঁর লেখায় । সমাজের পরিচয়হীন নারীর আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা বহুমাত্রিকতায় আভাসিত তার গল্পে । এ গল্পের প্রধান চরিত্র মণিকা । গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেই গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে। পরতে পরতে খুলতে থাকে গল্পটি । মণিকার পরিচয়টিও । যে শিক্ষিত সমাজ এক সময় তাকে কিংবদন্তীর পর্যায়ে তুলে দিয়েছিল। তারাই তার পরিচয় জানার পর আশ্চর্য উদাসীন হয়ে পড়ে। সমস্ত ভলোমানুষীর মুখোশ খুলে যায় তাদের। যে শীকর গুপ্ত মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় মানুষ - এমন জোরালো দাবী করে সংস্কারমুক্ত আধুনিক মানুষ হতে চেয়েছিলেন এম সময়। সে মণিকার সামাজিক পরিচয় জানবার পর আশ্চর্য নীরব হয়ে গেলেন। একসময় নিজে এগিয়ে এসে ঘর বাঁধার কথা বলেছিলেন, তিনিই কিনা সামাজিক স্বীকৃতিহীন বলে মণিকাকে ভুলে থাকলেন। সংসার করলেন প্রেসিডেন্সির ভালো ছাত্রী দেখে। এই দেখনদারীর দাড়িপাল্লায় মাপা হয় মানুষকে। মাপা হল মণিকাকে, মণিকা পোড় খাওয়া। সে আগেই চিনে নিয়েছিল এ সমাজকে। তাই শীকরকে খুব একটা উৎসাহিত করেনি। জানতো সমাজ পিতৃ-মাতৃহীন অনাথকে, গোত্র-পরিচয়হীন অনাথকে জেনে শুনে স্বীকার করবে না। হলোও তাই। শীকর মণিকাকে অবজ্ঞা করল, তার স্কুলের চাকরীকে অবজ্ঞা করলো। অমিত্বকে জাহির করল। কিন্তু মণিকা বিচলিত না হয়ে যখন প্রত্যুত্তর দিল তখন সে চমকে গেলল। ভেবেছিল সে ছাড়া মণিকার কোন গতি নেই। কিন্তু যখন শুনল সর্দারজীর সঙ্গে বিয়ের কথা তখন তার অহং -এ আঘাত লাগলো। সে আর দাঁড়াবার সাহস করল না মণিকার সামনে। মণিকা যদিও

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মিথ্যে বলেছিল শীকরকে। তা হলেও এ ছিল তার মর্যাদার লড়াই। সে লড়াইতে মণিকা শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে, আদর্শগত দিক থেকে অন্তত শীকরের কাছে। যদিও পড়াশুনোয় সে আগেই শীকরকে দেখিয়ে দিয়েছিল তার উৎকর্ষতা। সেখানে শীকর অনেক পিছিয়ে। পিছিয়ে মানসিকতায়। কিন্তু সমাজতো এমনই। কঠোর-কঠিন। সংস্কারচ্ছন্ন। চিন্তনহীন। অসাড়। একে মেধা দিয়ে আঘাত করলে বিপদ। মেধাহীনের আস্ফালন তখন লোলজিহ্বা নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু তা বলে নিজের অধিকার বুঝে না নিলে তো নিজেকেই বঞ্চিত থাকতে হবে চিরকাল। তাই সে বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিজের স্থান করে নিতে চেয়েছে নিজের মত করে। সে মর্যাদার লড়াইতে অনেক এগিয়ে। নিজের সীমাবদ্ধতা সে জানে। জানে সমাজের দৃষ্টিকে। তাই সে সর্দারজীকে খুব সহজভাবে তার কৃতকর্মের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। কোনরকম করুণা ভিক্ষা সে করেনিচ।

এ সমাজকে সে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে চিনেছে। গভীরভাবে। তাই সমাজ সম্পর্কে তার সূক্ষম বিশ্লেষণ এক অন্য জীবনবোধের কথাই বলে -

> "পুরাণে আছে কণ্বমুনি মা-বাপের পরিত্যক্ত শকুন্তলাকে লালান-পালন করেছিলেন। কিন্তু সেটা সাধারণ মানুষের সমাজ নয়। সেটা মুনি ঋষি তপস্বীদের সমাজ। শাশ্বত মানবধর্মের সমাজ। তাই শকুন্তলা আশ্রমে লালন পালনের পর, নানা সংঘাতের পর গৃহধর্ম পেয়েছিল। আর দুষ্যন্তও ছিলেন রাজা। অর্থাৎ নরপতি, তাই সমাজপতি। আমরা সাধারণ মানুষ, সমাজের বুদ্বুদমাত্র - এই আমার পরিচয়।"

নিজের পরিচয়ের আড়ালে সমাজকে চিনে নিচ্ছেন তিনি।

যাইহোক গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র এ মণিকা দাসের অতীত ইতিহাস তিমিরাচ্ছন্ন। তার জন্মও তাই। কিন্তু সে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। শেষ পর্যন্ত সর্দার তাকে গ্রহণ করতে চায়। সে অনুমতি চেয়ে রাখে মণিকার কাছ থেকে। তাই মণিকার দুঃখদীর্ণ, কঠোর জীবনে শেষ পর্যন্ত আশাবাদ ব্যক্ত হয়। সে তিমিরে বা অন্ধকারে জন্ম নিলেও আসলে একজন আলোকধারী আলোকবাহী সর্বোপরি আলোকিত মানুষ। তাই নামকরণ যথার্থ। মণিকা চরিত্র আপাদ-মস্তক ব্যক্তিত্বপূর্ণ। বাস্তব সম্মত ও সঙ্গত। জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখার প্রবণতাকেও এ গল্প বহন করেছে সঠিকভাবে। লেখিকার নিজের জীবনাভিজ্ঞতার ছায়াপাত ঘটেছে গল্পে। তাঁর সবটুকু মমতা গিয়ে পড়েছে মণিকার

ওপর। পড়া উচিতও। শীকর গুপ্তের মতো চরিত্রেরা সমাজকে পিছিয়ে দিয়েছে। স্থবির করে দিয়েছে। তাও বোঝা গেছে লেখার মধ্যে। সব মিলিয়ে সার্থক এই ছোটগল্প। নামে, চরিত্রে, পরিসরে, মেধায়।

অন্তঃসলিলা : সাবিত্রী রায়

টিপ্পনী

সাবিত্রী রায়ের প্রধান পরিচয় তিনি ঔপন্যাসিক সাবিত্রী রায় এক বৃহৎ বিস্তৃতি। তাঁর উপন্যাসে অনেকসময়েই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকায় আসীন চিত্রশিল্পী। 'মেঘনা-পদ্মা' উপন্যাসের এক ব্যাতিক্রমী চরিত্রায়ণে দেখা যায় এক নারী চিত্রশিল্পীর আত্মপ্রকাশ। নূতন কিছু নয় ছোটগল্পেও প্রধান চরিত্রে এক ভাস্কর। অর্থাৎ তিনি আখর দিয়ে ছবি আঁকতেন এমনই আমাদের মনে হয়। তাঁর কন্যা গার্গী চক্রবর্তি তাঁকে বাংলা সাহিত্যের 'প্রথম মহিলা রাজনৈতিক ওষপন্যাসিক হিসাবে চিহ্নিত করতে চান। তাঁর লেখিকাজীবনের আরম্ভ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গল্প ও অনুবাদের ধ্যে দিয়ে। তাঁর প্রথম অনুবাদ 'চোখের জল ফেলো না, মারিয়ানা' ও 'সৈনিকের চিঠি' সহ কয়েকটি ছোটগল্প পরপর প্রকাশিত হয় সে যুগের পত্রিকা 'অরণি' তে। সাবিত্রী রায়ের জন্ম ১৯১৮ সালের ২৮ এপ্রিল বুড়িগঙ্গার কোলে ঢাকা শহরের উয়াড়ি পল্লীতে। নলিনীরঞ্জন সেন ও সরযূবালা সেনের দ্বিতীয় সন্তান তিনি, শিক্ষা শুরু উপসী গ্রামের ছেলেদের স্কুলে। পরে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাশ করে পড়তে আসেন কলকাতার বেথুন কলেজে। সেখান থেকে বি.এ. পাশ। ১৯৪০ সালে শান্তিময় রায়ের সঙ্গে বিয়ে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. টি. পাশ করে কিছু দিন তিনি মাদারী পুর ও মুন্সীগঞ্জে শিক্ষিকার কাজ করেন। পরে কলকাতাতেও। তিনি ছিলেন রাজনীতি সচেতন মানুষ। তাই নিছক ঘরোয়া কাহিনী তাঁর রচনার উপজীব্য হতে পারল না। লেখা আসলে তাঁর কাছে ছিল এক সামাজিক কর্তব্য। সুস্থ জীবনবোধকে লেখার মধ্যে তুলে ধরাই ছিল তাঁর চেষ্টা। ৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৫ সালে তিনি মারা যান।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলন হল 'নূতন কিছু নয়'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়, তার যন্ত্রণা উঠে এসেছে তাঁর ছোটগল্পে। সেদিক থেকে তাঁর লেখা বাস্তবধর্মী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তি সময় সামাজিক ক্ষেত্রে যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল, মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা, ক্রূরতা, পাশবিকতা, হীনতা দেখা দিয়েছিল সে সব দিককে আবরণহীনভাবে তুলে ধরেছেন তিনি তাঁর গল্পে।

আমাদের আলোচ্য 'অন্তঃসলিলা' গল্পটি নূতন কিছু নয় (১৯৫২) গল্প

টিপ্পনী

সংকলনের অন্তর্গত। এই সংকলটিতে এগারোটি গল্প আছে। তার শেষ গল্পটি হল 'অন্তঃসলিলা'।

'অন্তসলিলা' গল্পটি এক নিম্নমধ্যিত্ত পরিবারের অসহায় গৃহবধূর জীবন সংগ্রামের কাহিনী। বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনে যে সংকট দেখা দিয়েছিল দ্বিতিয় বিশ্বযুদ্ধের পর তা থেকে ঘুরে দাঁড়ানর সংগ্রাম ছিল এ গল্পে। এ গল্পে দেখা যায় নারী কিভাবে অসংখ্য বন্ধন, প্রতিকূলতায় হারিয়ে না গিয়ে সংগ্রাম করে জীবনযুদ্ধে এগিয়ে চলার চেষ্টা করে, চেষ্টা করে নিজের সৃজনশীলতাকে বাঁচিয়ে রাকতে। এ গল্পের নায়িকা 'শকুন্তলা দেবী' এমনই একজন মানুষ। শকুন্তলা দেবী বিশ শতকের এক লেখিকা। তাঁর মাতৃত্ব, পত্নীত্ব সৃষ্টির আড়ালে ঢাকা পড়েনি তিনি প্রকৃত গৃহবধূ, কর্তব্যসচেতন মা, শাশুড়ির প্রতিও তার সম্ভ্রম যথেষ্ট। তিনি সন্তান নিজের ভাই সকলের কথা ভাবেন। বাড়ীতে অতিথি এলেও আতিথেয়তাও করেন। এত কিছু সামলে তিনি সৃষ্টি করে চলেন গল্প - উপন্যাস। সাবিত্রী রায় দেখান যে, শকুন্তলা দেবীর অন্তরে যে সৃজনশীলতার ফল্গুনদী অন্তঃসলিলার মত বয়ে চলে,তাকে বাইরের অভাব - অনটন, সাংসারিক দায়-দায়িত্বের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে হলে সংগ্রাম করেই তা জিইয়ে রাখতে হবে। শুধু তাই নয়, এই সংগ্রাম করতে করতে একটি নারী যে অন্তরে অন্তরে ক্ষয়ে যাচ্ছে, প্রতবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে, তাও তিনি গল্পের মধ্যে তুলে ধরেছেন।

গল্পটি শুরু হয় কফি হাউসের আড্ডা দিয়ে। সে আসরে রয়েছে রাধারানী পাবলিসারের কর্ণধার দেবব্রত, তার পুরনো লেখক বন্ধু শিবনারায়ন ব্যানার্জী শিবেশ রায় প্রমুখ। এরা শকুন্তলা দেবীর লেখা নিয়ে কটাক্ষ করে। দেবব্রত দৃঢ় প্রতিবাদ করে। রঞ্জন রায়ও করেন পরে আসা শকুন্তলাদেবীর স্বামীকে।

পরদিন দেবব্রত শকুন্তলাদেবীর লেখা নেবার উদ্দেশ্যে আসেন তার বাড়ী। কলকাতার এটি সরু গলি দিয়ে এসে পৌছোন সে ৮/৭ বি এর বাড়িতে। এখানেই একটি অপ্রশস্ত স্যাঁতস্যেঁতে ঘরে স্বামী কনা দেবর শাশুড়ী সদ্যজাতকে নিয়ে থাকেন নবীনা লেখিকা শকুন্তলা দেবী। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পারিবারিক কাজে তিনি সর্বদা ব্যাস্ত। ছোট দুই মেয়কে দেখাশোনা কলরতে য়। প্রকাশিতব্য যে নতুন গল্পটির জন্য দেবব্রত এসেছে তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শকুন্তলা দেবী ছাত্রী অবস্থায় ক্লাস নোট নেওয়ার খাতায়। তাও আবার অনেক ঘেঁটে ঘুটে তবে সন্ধান মেলে। এক সময় তো না পেয়ে আল ছেড়ে দিয়ে বলেই ফেলেন শকুন্তলা দেবী -

"পুড়িয়েই ফেললো নাকি ওরা উনুন ধরাতে ?"

শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়। দেবব্রত তার এমন বর্ণহীন অবস্থা দেখে বলে যে নিজেই সে টুকে নেবে। তাতে শকুন্তলা দেবী যেন কৃতার্থ হন।

গল্পের শেষ আর একটি দিক উঠে আসে। ভাই সুব্রতেকে কথা দিবেছিল যে লেখালেখির রোজগারের টাকার কিছু সে তাদের পার্টির তহবিলে দেবে। কি্তু শকুন্তলা তাও দিতে পারে না দারিদ্র্যের কারণে। দশটি টাকা পর্যন্ত দিতে পারে না। না পারার গ্লানি তার কম নয়। সাবিত্রী রায় শকুন্তলা দেবীর সে চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে -

> "ভাষাহীন বেদনার নীরব আর্তনাদে বুঝি ছিঁড়ে পড়ছে কোমল আত্মা। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ান একজন অ-দেখা কর্মীর প্রানের মমতায়, আর স্নেহের ভাইয়ের আশাভঙ্গের ব্যাথায় বিদীর্ণ দৃষ্টি। - তবু দশটি টাকাও দেবার শক্তি নেই তার !"

লেখা নিয়ে উঠে পড়ে দেবব্রত। আবার সেই নোংরা গলি দিয়ে যেতে যেতে ভবে -

> "এই মধ্যবিত্ত সংগ্রামের আড়ালেই কি বয়ে চলেছে লেখিকার জীবনের অন্তঃসলিলা প্রাণের প্রবাহ !"

'অন্তঃসলিলা' নামটি বাঞ্জনাধর্মি। তা শকুন্তলা দেবীর অন্তরের সত্তার পরিচয়বাহী। 'অন্তসালিলা' শব্দটির অর্থ হল মাটির নিচ দিয়ে প্রবাহিত যে স্রোতস্বিনী ধারা। বিহার রাজ্যের গয়ায় বয়ে যাওয়া ফল্গুনদীকে অন্তঃসলিলা বলা হয়। পোরাণিক মতে, সীতার অভিশাপে নাকি ফল্গু অন্তঃসলিলা। যাইহোক অন্তঃসলিলা আসলে আপাত কাঠিন্যের অন্তরালে বয়ে যাওয়া জীবনস্রোত, জীবনচর্যা যা শকুন্তলা দেবীর আপাত দারিদ্র্যময় জীবনের অন্তরালে বয়ে গিয়েছে, যাকে সাবিত্রী রায় আবিষ্কার করেছেন। লেখিকা শকুন্তলে সত্তাটি অন্তঃসলিলা স্বভাবের। শকুন্তলা দেবী দরিদ্র পরিবারের বধূ। মধ্যবিত্ত জীবন সংগ্রামের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। এই দারিদ্র্য ও জীবন সংগ্রামের অন্তরালে রয়েছে তারা সৃষ্টিমূলক লেখিকা সত্তা। তাই গল্পের নাম 'অন্তঃসলিলা'। সংসারের প্রবল প্রতিবন্ধকতা, অভাব, নৈরাশ্যের সঙ্গে অনর্গল লড়াই করেও তার অর্ন্তলীন সৃষ্টির ভুনন বাধাপ্রাপ্ত হবনি বরং তা নিভৃত, নিরবে স্বাভাবিক ভাবেই অন্তঃসলিলার মতো প্রবহমান।

অন্যদিকে অকুন্তলা দেবীর গৃহিনি স্বভাবতির মধ্যে রয়েছে এক

টিপ্পনী

অন্তঃসলিলাভাব। সকলের আবদার নির্বিবাদে পালন করেন। ভাড়াটে বাড়িতে বৃহৎ সংসারে শত সহস্র কাজের বাঁধনে বাঁধা পড়লেও তাঁর বিরক্তি বা ক্লেন্তি নেই। অসম সহিষ্ণুতায় তিনি সব কিছুকে উপেক্ষা করে নিজেকে সকল তচ্ছতার ঊর্ধ্বে স্থাপ করেছে। তার আত্মস্বার্থ চাপা পড়ে গেছে বৃহত্তর মানবতার ফল্গু স্রোতে। গৃহিনী সত্তার এই সঞ্জীবণী শক্তিকে 'অন্তঃসলিলা' নামের দ্বারা ব্যাঞ্জিত করা হয়েছে।

টিপ্পনী

আবার আর্ত ও অসুস্থ মানুষের কাছে নদাঁড়াতে না পারলে, তাদের সাহায্য করতে না পারলে শকুন্তলা দেবীর যে অন্তর্লী মানসিক অবসথা হয়, তা বোঝাতে 'অন্তঃসলিলা' নামটি তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজ সংস্কার সাধনে অক্লান্তকর্মী যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হলে তাকে দশটা টাকে সাহায্য করতে না পেরে তার যে সন্ত্রণা 'ভাষাহীন বেদনার নীরব আর্তনাদে বুঝি ছিঁড়ে পড়েছে কোমল আত্মা। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ান একজন অদেখা কর্মীর প্রাণের মমতায়। আর স্নেহের ভাইয়ের আশ ভঙ্গের ব্যাথায় বিদীর্ণ দৃষ্টি - অন্তসলিলা' নামকেই তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

কিম্বা দেবব্রতর দৃষ্টিতেও শকুন্তলা দেবির যে সত্তা উদ্ভাসিত হয়েছে তার মনে হয়েছে শকুন্তলা দেবী সত্যিই অন্তঃসলিলা। দেবব্রতর অণুভব - চিন্তা- চেতনা দিয়ে তারই দৃটিতে গল্পটি রচিত। লেখা আনতে এসে শকুন্তলা দেবীর বাড়ি, বাড়ির পরিবেশ, কাজকর্ম, আতিথেয়তা, লেখার উপাদান প্রভৃতি দেখে তিনি উপলব্ধি করেছেন, "এই মধ্যবিত্ত সংগ্রামের আড়ালেই কি বয়ে চলেছে লেখিকার জীবনের অন্তঃসলিলা স্বভাবকে পরোক্ষ দৃষস্টি দিয়ে দেখানো হবেছে এবং প্রমাণিত হয়েছে তার সেই সত্তার সারবত্তা। তাই ঘর ও বাহির, দারিদ্র্য ও সৃষ্টি, অভাব ও সহনশীলতা - সবদিক থেকে শকুন্তলা দেবীর অন্তঃসলিলা স্বভাবের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখিকা যথোপযুক্ত নামকরণ করেছেন।

এ গল্পে সাবিত্রী রায় দেখিয়েছেন, শকুন্তলার সাহিত্যজীবন বা সৃষ্টিশিলতা তার দারিদ্র্যপূর্ণ সাংসারিক জীবনথেকে বিচ্ছিন্ন নয় বরং একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বাস্তব ও কল্পনার মেলবন্ধনেই তো একজন মানুইষ পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে - সেই দিকটির প্রকাশ ঘটেছে শকুন্তলা দেবীর মধ্যে। কেননা তার মধ্যবিত্ত জীবন সংগ্রামের আড়ালেই রয়েছে লেখিকা সত্তার অন্তঃসলিলা প্রানপ্রবাহ। শকুন্তলা সেন মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের বধূ। স্বামী প্রফেসর সেন। দুই শিশু সন্তান, দেবর ও শাশুড়ী নিয়ে তাকে স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে ভাড়া দিয়ে থাকতে হয়। সংসারে সচ্ছলতা বিশেষ নেই। একটিই মাত্র ঘর। সেখানেই রান্নাবান্না, সেখানেই শোওয়া, স্তুপাকার করে রাখা বালিশ, মেঝেয় সিমেন্ট উঠষে

যাওয়া, এহেন বাড়ির পরিবেশ। রান্নার কাজে তাকে ব্যাস্ত থাকতে হয়। কলতলায় কাঁথা কাচতে হয়। সংসারের হাল তার হাতেই। পরিবারের অন্য সদস্যরা তাকে সাহায্য করে না উল্টে সমালোচনা করে। তার লেখালেখি নিয়ে দেবর 'বিষঝরা রসিকতা' করে, স্বামী প্রফেসর সেন গল্পপাঠের ফুরসৎ নেই বলে একরকম তাচ্ছিল্য করে, শাশুড়ী 'বিদহষী বৌ' বলে ঠাট্টা করে। এসবেতেই শকুন্তলা নির্বিকার। তিনি জীবনরসিক বলেই উপলব্ধি করেন দরিদ্র সংসারে অভাব থাকবে, তা নিয়ে হতাশ হলে চলবে না।

টিপ্পনী

ইতিমধ্যেই শকুন্তলা দেবীর দুটি গল্প পাঠক মহলে সাড়া ফেলেছে। তৃতীয় গল্পচের জন্য রাধারাণী পাবলিসারের দেবব্রতবাবুএসেছে। রঞ্জন রায় তার স্বামীকে তাচ্ছিল্য করে বলেছে -

> "এই যে প্রফেসর, দূরে দূরে কেন, তোমার বৌ তো এনতার লিখছে হে, এরকম ঘষতে ঘষতেই হাত পেকে যাবে।"

সাহিত্যিক মহলে এমন বিরুদ্ধতার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাকে। তা সত্ত্বেও তিনি হাল ছাড়েন নি লিখে গেছেন।

তার লেখার মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ ঘটেছে - 'ময়দানের দিকে এগিয়ে চলেছে আজার হাজার মানুষের মিছিল।' এতো এক সংগ্রামের কথাই তিনি লিখেছেন তার গল্পে। তিনি জানেন সংসারের মধ্যে থেকেই সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠার রসদ সংগ্রহ করতে হবে। এ সংগ্রাম একার। লেখার অবসর খোঁজার সংগ্রাম বাইরে সাহিত্য জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠার সম্মানজনকক স্বীকৃতির জন্য সংগ্রাম। এই সংগ্রাম সৃষ্টিশীলতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য। কিন্তু তা কত নীরব সেই স্বরূপই চরিত্রটিকে সহনীয় করে তোলে। শকুন্তলা দেবীর আত্মপ্রত্যয়ী সেই শক্তির জন্য চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে রয়েছে।

সরলরৈখিক প্লটে গৃহিনী ও লেখিকার সহাবস্থান মনোজ্ঞ রূপ লাভ করেছে। সমাজভাবনা ও রাজনৈতিক ভাবনা এনে পারিবারিক জীবনের কাহিনীতে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে। ঘর ও বাহিরকে বিভিন্নভাবে দেখিয়ে শকুন্তলা চরিত্রের স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে উদ্ঘাটের প্রয়াস বেশ বলিষ্ঠ। Climax অংশে শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে মূল লেখিকার অন্তরংগ প্রকৃতিটিও প্রতীকায়িত করা হয়েছে। Climax সৃষ্টি হয়েছে একজন সমাজকর্মীর অসুখে সামান্য দশটাকা সাহায্য না দিতে পারার মথ্যে। দরিদ্র হলেও তার মন যে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তার অন্তরের যে সমাজকর্মীর আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা রয়েছে তা সাবিত্রী রায় দেখিয়েছেন।

টিপ্পনী

গল্পের রচনা কৌশল ও অনবদ্য। কফি হাউসের আড্ডায় আলোচনা, দেবব্রত বাউর শকুন্তলা দেবীর বাযিতে এসে সমস্ত উপলব্ধি করা, ছোট মেয়ের অসুখে চিন্তিত হওয়া, প্রফেসর সেনের তাচ্ছিল্য আসলে শকুন্তলা দেবীর অন্তঃসলিলা স্বভাবকেই মেলে ধরার তাগিদে সৃষ্টি।

গল্পটিতে বর্ণনাবাহুল্য নেই। মেদহীন, ভাষারীতিও চরিত্রের ভাবানুসারী। যেমন প্রফেসর সেনের উক্তি -

> "গল্পটল্প পড়ার কি আর ফুরসৎ আছে।"

কিম্বা -

> "মিষ্টি হাসির অজস্রতা কচি চোখে। যেন একটি সোনালী রোদের রেখা জোর করেই ঢুকে পড়েছে এ আবদ্ধ ঘরে। ওপাশে আবার অদৃষ্টিকে কশাঘাত শুরু হয়ে যায়।"

সবমিলিয়ে কেন্দ্রীয় চরিত্রের অন্তসলিলা স্বরূপের বর্ণনায়, চরিত্রচিত্রণে ও পরিবেশ সৃষ্টিতে 'অন্তঃসলিলা' একটি উৎকৃষ্ট ছোট গল্প।

আইন : প্রতিভা বসু

রানু সোম থেকে প্রতিভা বসু এবং গায়িকা ধেকে কথাসাহিত্যিক - এই বিবর্তনের ইতিহাস চমকপ্রদ। গান শিখেছেন দিলীপ কুমার রায়, নজরুল ইসলাম, হিমাংশু দত্ত ও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে। গান তাঁকে অজস্র সম্মান দিলেও কবি বুদ্ধদেব সবুর সঙ্গ তাঁর বাড়ির সাহিত্যিক সত্তায়। 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ল 'অনর্থক', গল্প, প্রশংসিত হল। তাঁর অধিকাংশ বইই বানিজ্যিকভাবে সফল হয়েছিল।তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'মাধবীর জন্য' প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালে এবং প্রথম উপন্যাস 'মনোলীনা' প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে। উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও শিশুপাঠভ রচনা সহ তিনি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি 'ছোটগল্প' ও বৈশাখী' নামে দুটি পত্রিকাও সম্পাদনা করতেন। তাঁর গল্পের মচুখ্য বিষয় জীবনরস। বাংলা ভাষায় অনণ্য অবদানের জন্য কললকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদকে ভূষিত করেন। এছাড়াও, তিনি আনন্দ পুরস্কার লাভ করেন। এই মহান শিল্পী অবিভক্ত বাংলার ঢাকা শহরের অদূরে বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৫ সালের ১৩ই মার্চ এবং মারা যান ২০০৬ সালের ১৩ অক্টোবর।

আমদের আলোচ্য 'আইন' গল্পটি 'হারিয়ে যাওয়া গল্প' গ্রন্থের অন্তর্গত। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালের 'বর্তমান' এর প্রথম শারদ সংখ্যায়। গল্পটি বলাওর ধরন খুবই চমৎকার। বীশ শতকেদর শেষ দুই-তিন দশক এই গল্পের পটভূমি। তিনি গল্পটি যে সময়ে লেখেন সে সময়েরই গল্প এটি। মূলত ভাড়াটে সমস্যা এ গল্পের প্লট। গল্পে দেখা যায় কেমনভাবে কলকাতার ভবানীপুরেরএকটি পুরোনো বাড়ি ভাড়াটের হাতে ক্রমশ বেদখল হয়ে যায়। শুধু বেদখল হয়েই শেষ হয় না। ফৌজদারী মামলাতে বাড়ির মালিক অতি সজ্জন ব্যক্তি নির্মলবাবুর জেল পর্যন্ত হয় বার্ধকে এসে। এমন জ্বলন্ত সমস্যাকে প্রতিভা বসু রূপ দেন তাঁর ছোটগল্প 'আইন' এ।

বিশ শতকের শেষ দুই-তিনটি দশক এই গল্পের পটভুমি। তখন পশ্চিমবঙ্গ অস্থির। চোর, ডাকাত, রাজনীতি, উদ্বাস্তু, কালোবাজারী, গুন্ডা, জবরদখলকারীর পশ্চিমবঙ্গ চলছে তখন। দেশোদ্ধারের নামে একশ্রেণীর গুন্ডা - বদমাইশদের অতি কুৎসিত আস্ফালন চলছে, রাজনৈতিক দল তাদের আবার মদত দিচ্ছে, একটা ভয়ানক অন্ধকারের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে সে সময়ের বাংলা। নানা রকম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে তখনকার সাধারণ গৃহস্থ পরিবারগুলি। প্রতিভা বসু তারই একটা নমুনা তুলে ধরেছেন এ গল্পে।

গল্পটি শুরু হয়েছে শেষ থেকে। যত সময় গেছে আস্তে আস্তে আদি মধ্য অংশ পাওয়া গেছে এবং শেষ পর্যন্ত আবার ফেরৎ গেছে শেষে। অদ্ভুত সুন্দর এই গল্পের বুনন। এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পচরিবারের পাঁচ ভাই বোনের একমাত্র ভাই নির্মলবাবু। তার চাকরীর খবরে লাহিড়ি বাড়িতে আনন্দের বান ডেকে গিয়েছিল। বি.এ. বি. টি. হয়ে পুরো দুবছর তাঁকে চাকরির অভাবে বসে থাকতে হয়েছে। তাছাড়া নির্মলবাবুর বাবা সুবিমলবাবুর মাস্টারি জীবন যখন ধার দেনায় তলিয়ে তখনই এই সুসংবাদ। শিলিগুড়ি হাইস্কুলের সংস্কৃতের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন কাজে। একেবারে অবসর নিয়ে ফেরেন পৈত্রিক বাড়ি কলকাতায়। গল্পটি যখন শুরু হয়েছে তখন নির্মলবাবুর বয়স চৌষট্টি। সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত। নিতান্তই লেখাপড়ার মানুষ। তাঁর দুটি ছেলে, দুটি মেয়ে। দুই ছেলেই এখন প্রতিষ্ঠিত। বড়ো কন্যাটিকেও সৎপাত্রে বিয়ে দেওয়া গেছে। সবাই ওরা ভালো আছে, সুখে আছে। নির্মলাবাবুদেদর সাবেক বাড়ী ছিল পাবনায়, সেখানকার লাহিড়ি পরিবারের ছেলে তিনি। তবে বড়ো হয়েছেন তিনি কলকাতাতে, কলকাতায় যে বাড়িতে তাঁর বেড়ে ওঠা সেই বাড়ি নিয়েই এই গল্প। এই বাড়িটির বর্ণনা দিয়েছেন লেখক -

"ভবানীপুরের চাউল পট্টিতে তাঁর পৈতৃক বাড়ি, বাড়িটি খোলামেলা,

টিপ্পনী

টিপ্পনী

চারপাশেই একটু একটু করে জমিঝায়গা ছেড়ে রাখা আছে। ভবানীপুর গ্রামটি শহর হয়ে ওঠার আগেই নির্মলবাবুর ঠাকুর্দামশাই বাড়িতি কোনো সৌখিন জমিদারের কাছ থেকে কিনেছিলেন। সেই জমিদার সম্ভবত এ বাড়িকে বাগানবাড়ি হিসেবেই ব্যবহার করতেন। বাড়িটির গড়ন দেখলে সে রকম মনে হয়। মাঝখানে শ্বেতপাথরে বাঁধানো বিরাট একটি হল ঘর, সামনে ঢাকা বারান্দার দু'পাশে দুটি শয়নকক্ষ, আবার হলঘরের দু'পাশে দুটি শয়নকক্ষ, আবার পিছনেও সেইরকম ঢাকা বারান্দা, তার দুপাশে দুটি ছোটো ঘর। পিছনে উঠোন, জলকল দুটি বাথরুম, উল্টোদিকে কাজের লোকেদের জন্য টালির ঘর। সব ঘর থেকে সব ঘরে যাবার দরজা আছে, আবার আলাদা ঘরথেকে আলাদা আলাদা বেরিয়ে যাবারও পথ আছে। অর্থাৎ প্রত্যেক ঘরেই দরজা বন্ধ যেমন আলাদা, তেমনি বেরিয়ে যেতে চাইলেও অলক্ষ্যে বেরিয়ে যাবার অসুবিধে নেই।"

নির্মলবাবুর ছোটমেয়ে লোপামুদ্রা উত্তরবঙ্গ থেকে সংস্কৃত অনার্স নিয়ে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এ. পাস করেছে। ওর ইচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া। সবই ঠিকই এগোচ্ছিল। বেশ কিছুকাল আগে নির্মলবাবুর মামারা যাওয়ার পর পর নির্মলবাবুর বাবার এক স্কুলের বন্ধু তার বাবার কাছে ঘর ভাড়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। তার বাবা সুবিমলবাবুর একেবারেই মত ছিল না ঘর ভাড়া দেওবার ব্যাপারে, ছেলেদের বাহানায় তিনি পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন। একদিন নির্মলবাবুই রাজী হয়ে যান বাবার বন্ধু সেই বিপদগ্রস্থ প্রভাত সর্বাধিকারীকে বাড়ি ভাড়া দিতে। প্রভাতবাবু বলেন -

"আমাকে একটি মাত্র ঘর দিলেই হবে। আর পিছনে তোমার চাকরবাকরের টালোইর ঘরখানা - ব্যাস, আর আমার দরকার নেই।"

নির্মলবাবু বলেন -

"হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, আপনি থাকুন - না, জল, কল - এন্ট্রেস সবই তো আলাদা। সামনের দিকটা দিয়ে আমরা যাব আসব, পিছনের দিকটা দিয়ে আপনারা যাবেন আসবেন।"

সেই সূত্রেই প্রভাতকাকা -কাকীমা আসে বাড়িতে। আসে বড় ছেলে ও তার বৌ এইভাবে প্রথমে দখল হয় পিছনের ঢাকা বারান্দা। ভাড়া দিল মাত্র তিরিশ টাকা।

সুবিমলবাবু লজ্জায় আর চাইতে পারেনি। এরপর এল ছোটছেলে। মামা বাড়িতে থাকতো। ফেল করে সেও চলে এল পাকাপাকি ভাবে।

ইতিমধ্যেই সুবিমলবাবু মারা যান। শ্রাদ্ধশান্তি মিটে গেলে সবাই একে একে ফিরে যায় যার যার কর্মক্ষেত্রে। নির্মলবাবুও ফেরে। কিন্তু প্রভাতবাবুর স্ত্রী মধুর বচনে বাড়ির চাবিটি একপ্রকার হাতিয়ে নেয় নির্মলবাবুর কাছ থেকে। এদিকে প্রভাতবাবু মারা গেছেন। বড় ছেলে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়েছে। ছোটছেলে রণেন চূড়ান্ত অমানুষ। রাজনীতি করে। ঘুরে বেড়ায়। সেই-ই বাড়ির তালা কুলে একপ্রকার সব দখল করে বসেছে। নির্মলবাবু পঁয়ত্রিশ বছর শিলিগুড়িতে কাটিয়ে অবসরকালী জীবন স্থায়ীভাবে পৈত্রিক বাড়িতে কাটাতে এসেই বিপদে পড়লেন। এসে দেখলেন সব জবরদখলন হয়েছে। কাকীমা বেসুরে কথা বলছেন। ভাড়া দিবে থাকে তারা এত কধার কিছু নেই। রিফিউজিরা দখল করেনি এই ঢের। যে বাড়ির ট্যাকস্ দিতে হয় দেড়শো টাকা, সেখানে তিরিশটাকা ভাড়া দিয়ে কাকীমার এই বাঁকা কথা। যেন তারাই মালিক। রণেন, সে রাজনীতির 'বাই প্রোডাক্ট'। গুন্ডা সে, মুখের ভাষাও তেমনি। সে এসে নির্মলবাবুকে শাসিয়ে যায় -

> "যান যান বেশি রোয়াব দেখাবেন না। এখন আর আপনাদের ছাগল ভেড়ার রাজত্ব নেই, বুঝলেন " জামানা বদলে গিয়েছে। আপনাদের মত বুর্জেয়া বাড়িওলা বদমাসদের এখন টিট করে ছাড়ব। ঐ যে দিয়েছি ঐ ঢের। ভালো চান তো সরে পড়ুন।"

এবার সবটা বেদখল হল। ছেলেরা ছুটে এল কিন্তু কিছুই করতে পারলো না। ফিরেও গেল। এদিকে রণেনের আস্ফালন বেড়েই চলেছে সঙ্গ-পাঙ্গরা রণেনকে বোঝায় এখন আইন ভাড়াতের পক্ষে। ঐ মেয়েটাকে দেখে সে যেন গলে না যায়। লাম্পট্যের চরম শিখরে পৌঁছে গেছে রণেন। আর সহ্য করতে না পেরে উকিলকে দিয়ে বাড়ি ছাড়ার নোটিশ পাঠালেন নির্মলবাবু। এতে বিপরীত হল। সন্ধ্যাবেলায় লোপামুদ্রা বাড়ি ফেরার পথে অন্ধকারে রণেন তার গায়ে হাত দেয়। লোপামুদ্রা জুতো পেটা করেরণেনের ঠোঁট ফাটিয়ে দিল। কিছুক্ষন পর রণেন সদলবলে এসে অহরাব্য কুশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করতে লাগল। নির্মলবাবু হাতের কাছে পূর্বপুরুষের পাঁঠা বলি দেওয়া রামদা নিয়ে বেরোলে সবাই ভয় পেয়ে দৌড়ষে পালায়। সোজা ভবানীপুর থানায় এফ. আই . আর করে আসে। মেরে যে রক্ত বার করে দিয়েছে তার তো প্রমাণ ছিলই। পুলিশ এল ইনভেস্টিগেশনে। রামদা দেখলো। তবে মেয়ে কলগার্ল কিনা, সত্যিই অধিক রাত্রে গাড়ি

টিপ্পনী

করে বাড়ি ফেরে কিনা সে নিয়ে আর পুলিশ মাথা ঘামায় নি।

গল্পের শেষটা লেখকের বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। বীভৎসতার কী রুপ ! প্রতিভা বসু লেখেন -

'অপরাধ সাব্যস্ত হলো। বিচার হলো। আইন সংগতভাবে শাস্তিও হলো। বলবার কিছু নেই। আর নির্মলবাবুই যদি জেলে চলে গেলেন মেয়ে নিয়ে বিদ্যাবতী আর সেখানে থাকেন কোন্ ভরসায় ? রণেন তালা লাগাতে দিল না দরজায়, গায়ের জোরে ঢুকে বসে বন্ধুদের নিয়ে পা নাচাতে লাগল। যে বাড়ির জন্য বাড়িওয়ালার মাসে ট্যাকস্ লাগে দেড়শো টাকা সে বাড়ি মাত্র তিরিশ টাকা দিয়ে চিরকালের জন্য রণেনদের হয়ে গেল।"

প্রতিভা বসু বিশ শতকের শেষ কটি দশকের যুগ চিহ্ন এঁকে দিয়েছেন ছোট ছোট কিছু ছবির বর্ণনা দিয়ে। এক হল তখনকার রিফিউজি সমস্যা। দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক মাফিয়াদের বাড়বাড়ন্ত। মেয়েদের নিরাপত্তা বিগ্নিত ল আইনের দোহাই দিয়ে সমাজের সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে আন্ধআইন। কালাকানুন। এ গল্পটি যতটা ট্র্যাজিক তার চেয়ে বেশি বীভৎস। মানুষের মানবিকতাকে হত্যা করা হয়েছে যে সময়ে তাকে তুলে ধরেছেন সৃষ্টা। একজন প্রবীন সৎ বিদ্যান মানুধষ তাঁর চাকরি জীবনের শেষে আত্মরক্ষার জন্য জেল খাটছেন। স্ত্রি-কনভাকে বিপদদর মধ্যে ঠেলে দিয়ে এ অসহয়তা আমাদের ভাবায়। বাহুবল চিরকালই শাসন করেছে সমাজকে। রাষ্ট্র যে এক বিবেকহীন অন্ধবিচার পদ্ধতি মেনে ভুল বিধান দেয় তাও সত্য। এ গল্প তো কল্পনিক হতে পারে না। এ তো ইতিহাস। আইনের নামে সবই বেআইনি হচ্ছে। একজন গুন্ডা থানায় গিয়ে একজন ভদ্রলোকের নামে অভিযোগ করে আসে।এমন কি যে যুবতী কন্যার গায়ে হাত দেয় রাতর অন্ধকানরে। সেই মেধাবী মেয়েটির নামেও নালিশ জানায় যে সে নাকি কলগার্ল। যদিও পুলিশ সে দিকটি নীয়ে মাথা ঘামায় নি। প্রতিভা বসুর এ ব্যাঙ্গ কি সমাজপতিরা বুঝবেন ? বুঝবেন কি আইন প্রণেতারা ? ব্যাঙ্গার্থে এই গল্পের নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। আসলে আইন বলে যে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই এ পোড়া বাংলায় তা আরও একবার এ গল্প প্রমাণ করে দেয়। দৃঢ় বাধুনীযুক্ত এ গল্প যুগের গল্প। সময়ের গল্প। ইতিহাস।

টিপ্পনী

পত্র-পরিচিতা : আশালতা সিংহ

আশালতা সিংহ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ পরিবারে ১৯১১ সালের ১৫ জুলাই বাংলা

১৩১৮ সনের ৩০ শে আষাঢ়, কৃষ্ণা চতুর্থি তিথিতে, শনিবার জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান বিহারে বঙ্গসংস্কৃতির তৎকালীব কেন্দ্রভূমি ভাগলপুর শহরে। আদি নিবাস মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণাতে। তাঁদের মূল পদবী 'দাস' কিন্তু ভাগলপুরে তাঁরা সরকার উপাধিতেই পরিচিত। তাঁর মা যোগমায়া দেবী, বাবা যতীন্দ্রমোহন সরকার। শৈশবে মৃত সন্তানদের হিসেবের বাইরে রাখলে তাঁদের সাত ছেলে আর দুই মেয়ে। আশালতাই সবার বড়ো। আশালতার বাবা যতিন্দ্রমোহন বাবু পেশায় ছিলেন আইন ব্যবসায়ি। তিনি অত্যন্ত সদাশয় মানুষ ছিলেন। ছিলেন শিল্প অনুরাগী। আশালতা ছিলেন পিতৃস্নেহৈকলগ্না। বাবার সাহচর্যে ও সাহায্যেই আশালতার শিল্পীসত্তা বহুদিন পর্যন্ত বিনা বাধায় বিকশিত হয়ে উঠতে পেরেছিল। একসময় বাল্যকালে গান্ধিজীর কথা মতো স্বদেশী আন্দোলের জন্য নিজের গয়নাও দিয়েছিলেন। আশালতা প্রচন্ড বইভক্ত ছিলেন। এককথায় বইপোকা ছিলেন। বাবা তাকলে লাইব্রেরী থেকে বাংলা ও ইংরেজী সাইত্যের বই এনে দিতেন। এছাড়া তিনি রীতিমতো ভালো সঙ্গীত শিল্পীও ছিলেন। তাঁর বিয়ে হয় মাত্র তের বছর কয়েকমাস বয়সে। স্বামী পেশায় চিকিৎসক। ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ। তিনিও ছিলেন সাহিত্যানুরাগী মানুস। তবে তার সঙ্গে অনেকক্ষেত্রেই আশালতার মেলেনি। প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী হেমেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে তার প্রাক্-বৈবাহিক সখ্যয় ছিল। এ ঘটনায় স্বামীর সঙ্গে তার দূরত্ব বাড়ে। যাইহোক, প্রতিভাময়ী, বিদূষী আশালতা সিংহ মারা যান ১৯৮৩ সালে। ততদিনে তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত কথাকার ; প্রাবন্ধিক - সৃজনশিল লেখক।

'পত্র-পরিচিতা' গল্পটি ১৩৪০ সনের কার্তিক মাসে প্রকাশিত। 'পত্র পরিচিতা' উর্মিলা নামের এক প্রবীনা লেখকের জিয়নেদর গল্প। কিন্তু গঙ্গা আর চাঁপাগাছ আর কাঁচের প্লেটে একরাশ চাঁপাফুলের অতিপরিচিত ভাবনুষঙ্গে উর্মিলার সত্তায় আশালতাকে চিনে নিতে ভুল হয় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে,আশালতার সবচেয়ে প্রিয় ফুল চাঁপা। এই চাঁপার কথা কতো গদ্যে আর কতো গল্পে যে এই গঙ্গাতীর আর চাঁপাগাছের বর্ণনা হয়েছে তার কোন হিসেব নেই।

আই. এ. পরীক্ষা দিয়ে উর্মিলা তার দীর্ঘ ছুটির অবসরে অনেক কিছু করতে করতে গুটি দুই তিন গল্প আর আধ-খাতা কবিতা লিখে ফেলে ; স্থানীয় ও পরিচিত ভক্তমন্ডলীর উচ্ছসিত উৎসাহে সে সব লেখা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছেপে বেরোবার পর সে যে হঠাৎ লেখক হয়ে ওঠে তাই নয়, দু'একজন ভক্তের চিঠিও পেতে শুরু করে। এই ভক্তদেরই একজন হচ্ছে নির্মল সেন। উমিলার অমুক গল্পের অমুক পুরুষ চরিত্রটি

টিপ্পনী

ঠিক কাকে ধভান করছে এই কূট প্রশ্ন তুলে নির্মলের চিঠি লেখা শুরু। দুজনের পত্রালাপ মাসদুয়েকের মধ্যে এত দ্রুত এত ঘন হয়ে ওঠে যে মনে হয় মামুলি মুখোমুখি আলাপে এটুকু দাঁড়াতেই হয়তো বা সময় লাগত দু'বছর।

টিপ্পনী

ঊর্মিলা বাস্তবিক খুব বাস্তবসম্মত মেয়ে। সে আই. এ. পাশ করবার পর বি. এ. তে অঙ্ক অনার্সের সঙ্গে তার নির্বাচিত বিষয় হচ্ছে অর্থনীতি। শক্ত শক্ত অঙ্ক কষার ফাঁকে সে গল্প আর কবিতা লেখে বটে, কিন্তু চায়ের পেয়ালার সামান্য ইতরবিশেষ হলে, কিংবা খাম-পোস্টকার্ড কিনে এনে দেবার পর দু পয়সার হিসেবে গরমিল হলে, কিংবা শাড়ির পাড় খারাপ হয়ে গেলে, তার আশেপাশের লোকজনদের তটস্থ করে তুলতে তার কোনো সঙ্কোচ হয় না। অথচ মানবমনের চিরন্তন আত্মবিরোধবশে ঊর্মিলা চিঠির পর্দার আড়ালে থেকে নির্মলের কাছে নিজের স্বভাবের এই গদ্যাংশটাকে অনাবশ্যক বিবেচনা করে সযত্নে পরিহার করে। চিঠির সর্বত্র যে ঊর্মিলাচরিত ফুটে ওঠে, সে মেয়ে সর্বদাই গভীর, গভীরতম ভাবলোকে বাস করে ল গভীর সৌন্দর্যাবেশে সে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন। সে কেবল বসে বসে গঙ্গার সৈকতভূমি দেখে। সূর্যোদয় এবং সুর্যাস্তলীলা তার জীবনের প্রধান পটভূমিকা। কেশে তার ধূপের গন্ধ, আঁচল মদির স্নিগ্ধ। সে যেন এই মডার্ণ যুগের মেয়েই নয়। বহুযোজন দূরের একটি দীপ্ত তারা। বিধাতার মতো নিজেকে নিজেই সৃষ্টি করে তোলার মোহে সে চিঠিতে লিখে চলে - শ্রীলোক সুলভ শপিং করায় তার আন্তরিক অনাগ্রহ। বাজারহাটের পারিপার্শ্বিক তার কাছে 'কী অসহ্য স্থূল', কী ভালগার'!

বিধাতা বোধহয় অলক্ষে হেসেছিলেন। ইস্টারের ছুটিতে কলকাতায় দিদির বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ঊর্মিলা তার দিদিকে নিয়ে নিউমার্কেটের যে দোকানটিতে ঢুকে মহোৎসাহে শাড়ির দরদসতুর করছে এবং গোটা পাঁচেক টাকা কমিশনবাবদ ছাড় আদায় করছে, ঠিক সেই দোকানেই তখন নির্মলও একজন খদ্দের। ক্যাশমেমোতে লেখার জন্য দুজনেই দোকানিকে নিজেদের নাম বলে এবং দদোকান থেকে বেরিয়েই নির্মলের সমপ্রতিভ কৌতূহলে দুই পত্রালাপীর বাক্যালাপ শুরু হ। কাকতালীয় ঘটে যাওয়া এই দস্তুর মত রোমান্সে নির্মলের মন উদ্বেল হল, কান দুটো লাল, বুক দুরুদুরু এবং কণ্ঠস্বর কম্পমান। পুরুষের এই শারীরিক অনুভাবগুলি একসঙএ মিলে যে বীশেষ মনোভাবের খবর দেয় তাএ বোঝা যায় যে, সে যুগে নারীপুরুষের 'সাহিত্যিক' বন্ধুত্বগুলির নিহিত প্রচ্ছায়ে মিউজের চেয়ে এরসের প্রকোপই ছিল বেশি। তবে ঊর্মিলার চিঠির সঙ্গে তার আচরণের অসংগতি যেমন এরসের প্রকোপবশত নির্মলের নজরেই পড়ল না, ঊর্মিলার দশা ঠিক তেমন নয়। পুরুষভক্তকে উত্তরোত্তর মুগ্ধ করবার অভিপ্রায়ে চিঠির পর

চিঠিতে নিজেকে ধ্রুপদী রহস্যময়ীনরূপে প্রদর্শিত করবার শিল্পিত মিথ্যচারে কোথাও কি Coquetry ছিল না ? ছিল বই কি ! বিধাতা সেই মিথ্যাকচে এক ধাক্কায় নির্মলের সামনে ভেঙে দিবেছে ভেবে ঊর্মিলারও মন ভেঙে গেল । কিন্তু ওকে বিধাতা যেমনটি গড়েছেন, যদি তার উপরেও তুলি চালাতে ও না পারল, তাহলে ওর মুগ্ধ ভক্ত নির্মলের কাছে ওর আত্মপ্রকাশের মধ্যে আবেশ থাকল কোথায় ? কাজেই সেদিন বিকেলে ঊর্মিলার দিদির বাইতে আমন্ত্রিত নির্মল যখন ঊর্মিলাকে তার সম্প্রতি প্রকাশিত অমুক গল্পের অমুক নারীচরিত্র কেন প্রেমে না পড়েই সিনিক্ হয়ে উঠল গোছের প্রশ্ন করে, তখন ঊর্মিলা সেই অমুক নারী চরিত্রের ভূমিকায় নিজে অবতীর্ণ হয় এং বাইক অভিনয়ে বলতে শুরু করে যে, প্রেমে ঘা খেয়েই সে সিনিক্ হয়ে উঠে হাতেদর কাছে যাকে পেয়েছে তাকেই বিয়ে করে ফেলেছে । স্বভাবতই ঊর্মিলাকে বিবাহিতা জেনে রোমান্সের বিয়োগব্যাথায় পাংশুবর্ণ নির্মল অশনিদেশ্য বিতৃষ্ণায় বলে ওঠে যে, ঊর্মিলার চিঠি পড়ে তার ধারণা হয়েছিল সে এ যুগের মেয়ে নয়, মালবিকা-পত্রলেখা যুগের মেয়ে। কিন্তু এখন তার কী মনে হচ্ছে ? এখন তার মনে হচ্ছে, ঊর্মিলা আল্ট্রামডার্ন, অতি - আধুনিক । ঊর্মিলা সম্বন্ধে নির্মলের এই চূড়ান্ত ভাবান্তরের তাৎক্ষণিক পত্রতিক্রীয়ায় ঊর্মিলার স্বতঃস্ফূর্ত এপিগ্রামটি উপভোগ্য -

"কী জানেন, ওটা একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ।"

অর্থাৎ দুটিই যেহেতু ছদ্ম, অতএব দুটিই মিথ্যা । ঊর্মিলার এই এপিওগ্রামের নিহিতার্থ নির্মল বোঝেনি, কিন্তু এইচ এপিগ্রামটিই বুঝিয়ে দেয়, নিষ্কাশিত অসলিতা তার আরানো ক্ষুরধার ফিরে পেয়েছে।

ঊর্মিলার কলকাতা থেকে ফিরে গেল তার গঙ্গাতীরের চাঁপতলায়। নির্মলের চিঠি আর আসে না। কলেজ খোলা ধাকলে ঊর্মিলা এখন শূধু অঙ্ক কষে, আর কলেজ ছুটি থাকলে চলে তার দাবাখেলা। মাসিকপত্রের সম্পাদকচরা যতই তাগাদা দিন, গল্প আর কবিতা লেখা নৈব নৈব চ।

ঊর্মিলার এই সিদ্ধান্ত কি একটা নঙর্থক সিদ্ধান্ত নয় ? ভক্তপাঠকের কাছে নিজেকে আর বানিয়ে তুলব না বটে, কিন্তু তাই বলে একেবারে লেখাই ছেড়ে দেব ? লক্ষ করতে হবে, ঊর্মিলা প্রথমে শূধু নিজেকে বানিয়ে তুলেছে বটে, কিন্তু শেষে নিজেরই বানানো চরিত্রের আদলে নিজেকে বদলে দেবার চেষ্টা করেছে। প্রথমটি শুধু লিখনক্রিয়া, কিন্তু পরেরটি অভিনয়ক্রিয়া। প্রথমটিতেও স্নায়ুর ওপর অল্প চাপ পড়ে বটে, কিন্তু পরেরটি

টিপ্পনী

যদি অভ্যাস হয়ে যায় তবে স্নায়বিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা। ঊর্মিলা লেখা ছেড়ে দিয়ে যেন সেই সম্ভাব্য আত্মখন্ডনের দুর্যোগ থেকে নিজেকে বাঁচায়। তার অঙ্ক কষা আর দাবা খেলা যেন mythos থেকে logos এর দিকে কাল্পনিকতা থেকে যৌক্তিকতায় নিজেকে সংহত ও সুস্থিত করে তোলার আয়োজন।

টিপ্পনী

১৩৪০ সনের বৈশাখের (এপ্রিল - মে ১৯৩৩) 'পুষ্পপাত্র'- য় আশালতার উদ্দেশে প্রকাশিত সুদীর্ঘ পত্র প্রবন্ধে দিলীপকুমার লিখেছীলেন -

"তুমি লেখা ছেড়ে দেবে দেবে ভীষণ ভয় দেখাও যে।"

আসালতার এই লেখা ছেড়ে দিতে চাওয়ার একটা কারণ কি এই হতে পারে যে 'দেশের কাজ' - এর মতো ব্যতিক্রম বাদ দিলে এযাবৎ লেখা তাঁর প্রায় সমস্ত গল্পে তিনি নিজেকেই নানা ছাঁদে সাজিয়ে নিজেরই চতুর্দিক ক্রমাগত প্রদক্ষি করে গিয়েছেন ? অবশ্যই এগুলির মধ্যে মনস্তত্বের বিচিত্র সূক্ষ্মতা ও বক্রতার শিল্পরূপ কখনো কখনো চমকপ্রদ। কিন্তু এই আত্মকন্ডূয়নের পুনরাবৃত্তি শুধু পাঠকের পক্ষে কেন, লেখকের পক্ষেও কি সময়বিশেষ শ্রান্তিজনক নয় ? আশালতা কি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের, নিজের সাহিত্যিক পরিমন্ডলের বাইরে তাকান নি ? নিজেকেই শুধু 'চরিত্র' করে তুললেন ? আশালতা সিংহ আমৃত্যু এই রীতিই বজায় রেখেছিলেন তাঁর লেখায়। 'পত্র-পরিচিতা'তে তো বটেই।

ঘেন্না : সুলেখা সান্যাল

সুলেখা সান্যাল (১৯২৮ - ১৯৬২) নামটি আজ বিস্মৃত প্রায়। অথচ চল্লিশের দশকের উত্তাল দিনগুলোতে তিনি ছিলেন প্রগতিশীল মানুষদের মুখে মুখে প্রচারিত। জন্ম তাঁর ফরিদপুর জেলার বর্ধিষ্ণু গ্রাম কোড়কদীতে। মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান। কিন্তু তাঁর রচনা যথেষ্ট শক্তিশালী। তিনি একাধারে সাহি্যিক ও রাজনীতিবিদ। ছোতবেলা থেকেই তিনি প্রগতিশিল রাজনীতির সঙএ যুক্ত ছিলেন। কলকাতায় এসেও তা চলেছে। ১৯২৮ সালের ১৫ জুন সুলেখা সান্যালের জন্ম। চট্টগ্রামের মাসির বাড়িতে কেটেছিল তাঁর শৈশব। সাতবছর বয়সে লেখাপড়া শুরু করলেও ১৯৪২ সালে চট্টগ্রামে বোমা বিস্ফোরণের পর নিজের গ্রামে ফিরে আসেন এবং ১৯৪৪ - এ প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৬ সালে ফরিদাপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই এ পাস করে কলকাতায় গিয়ে ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন বি. এ. পড়ার জন্য। ১৯৪৮ সালে সুলেখা তাঁর পছন্দের এক রাজনৈতিক সহকর্মীকে বিয়ে করেন। একটি

বাম রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে গ্রেফাতার হওয়ায় জেল থেকে তাঁকে পরীক্ষা দিয়ে বি. এ. পাশ করতে হয়। ১৯৫৭ সালে তাঁর শরীরে লিউকোমিয়া ধরা পরলে চিকিৎসার জন্য মস্কো পর্যন্ত যান। কিন্তু ফিরে আসেন হতাশ হয়ে। ১৯৬২ সালের ৪ ডিসেম্বর সুলেখা সান্যাল মারা যান।

উপন্যাস এবং ছোটগল্প - এই দুটি ক্ষেত্রেই সুলেখা সান্যালের যথেষ্ট নিপুণতা ছিল। ছিল দার্ঢ্য। তাঁর একটি মাত্র ছোতগল্প সংকলন 'সিঁদুরে মেঘ'। এই সংকলনের বাইরেও আরো বেশ কিছু গল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলি হল - 'অন্তরায়', 'কীট', 'সংঘারত', 'বিবর্তন', 'ছেলেটা', 'একটি মমুলি গল্প', 'উলুখর', 'কিশোরী', 'পরস্পর', 'খোলাচিঠি', 'শকথেরাপি'। এচাড়া পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা তাঁর অন্যান্য গল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে - 'পঙ্কতিলক', 'মামণি', 'পাষন্ড', 'প্রতীক', 'যে গল্পের শেষ নেই', 'শেষ সন্ধ্যা', 'ঘেন্না', 'লজ্জাহর', 'ফাটল', 'রূপ', 'ভাঙ্গাঘরের কাব্য' ইত্যাদি। ১৯৬৪ সালে তাঁর 'সিঁদুরে মেঘ' গল্পটির চলচ্চিত্রায়ন হয়। তাঁর গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য বাস্তব ঘনিষ্ঠতা। প্রতিটি গল্পেই জীবনের বাস্তব ছবিকে তিনি তুলে ধরেছেন। চল্লিশ - পঞ্চাশের যে ঝঞ্ঝা ক্ষুব্ধ সময় তা সুলেখা সানাল্যের মূর্ত হয়ে উঠেছে। সুজাতা সান্যাল লিখেছেন -

> "সুলেখা সান্যালের ছোটগল্পগুলিকে আমরা তিনটি পর্বে ভাগ করতে পারি। প্রথম পর্ব 'সিঁদুর মেঘ' এবং অন্যান্য গল্প যেগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছে দাঙ্গা, দেশভাগ ও যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সজ্ঞাত সৃষ্টি। দ্বিতীয় পর্বে আমরা রাখতে পারি তাঁর ব্যক্তিগতজীবনের একান্ত যন্ত্রণাদগ্ধ কাহিনীর প্রতিচ্ছবির গল্পগুলি। তৃতীয় পর্বে একেবারেই নৈর্ব্যক্তিক বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্র, যা লেখিকার বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা প্রকাশ করে।"

সুলেখা সান্যালের অনেক গল্পের মৌল বিষয় দেশভাগ। এই দেশভাগের ফলে মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছিল। পূর্ব পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে বাংলাদেশ তথা পূর্ব পাকিস্থান থেকে এমন লাখ লাখ হিন্দু ধর্মাবলম্বী চলে আসে ভারতে রাজনীতির কারণে হঠাৎ করে এমন নিঃস্ব হয়ে যাওয়া মানুষ বারবারই কঠিন বাস্তবতায় সুলেখার গল্পে উপস্থাপিত। সুলেখা সান্যালের শেষ জীবন নিয়ে তাঁর অনুজা সুজতা সান্যালের (চট্টোপাধ্যায়) কথা -

> "১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিনি যেন জীবনকে ছেনে

টিপ্পনী

ছেনে নতুন নতুন মূর্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। জীবনের কাছ ধেকে পাওয়া তিক্ততা। বিশ্বাসহীনতা, নিঃসঙ্গতা তাঁকে ঠেলে দিয়েছে অদ্ভুত এক নৈর্ব্যক্তিক শূণ্যতাবোধের মধ্যে। এই সময় আমরা তাঁর শ্রেষ্ঠ রচণাগুলি পাই। নারীজীবন ব্যর্থতা, সবকিছু পাবার সম্ভাবনা থাকে সত্ত্বেও না পাবার যন্ত্রণা, অবসিত যৌবনের হতাশা, রোগের দুঃসহ ক্লেশ - সব কিছু রেখেগেছেন তাঁর এই সময়ের লেখার মধ্যে।"

টিপ্পনী

আমাদের আলোচ্য 'ঘেন্না' গল্পটির মধ্যেও এই দেশভাগেরই কথা, উদ্বাস্তু সমস্যার কথা বলা হয়েছে। দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু মানুষ ভারতবর্ষে এসে পশুর মত নির্যাতিত হয়েছে। কেউ টিকিয়ে রাখতে পেরেছে জীবন। কেউ আব্রু খুইয়েছে কেউবা জীবন। লেখক অভিজ্ঞতার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন এ গল্পে। ওপার বাংলার কত মানুষ, বিশেষত হিন্দুরা চলে এসেছে এপার বাংলায় শুধুমাত্র ভালোভাবে শান্তিতে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার আশায়। অনেকে আছে মৃতস্বামীর স্মৃতিকে বহন করে শিশু সন্তানকে নিয়ে জ্ঞাতি - গুষ্টির মানুষজনকে ফেলে চলে এসেছে এ দেশে। যে স্বপ্ন নিয়ে তাঁরা এসেছিল এদেশে তা মুহূর্তে ভঙ্গে খান খান হয়ে যায়। থাকে শুধু নির্মম বাস্তব। আর স্মৃতি ও স্মৃতিচারণা।

এদেশের প্রতিটি পদক্ষেপে স্খলনের ভয়। নিরাপত্তাহীনতার ভয়। পরিচয়হীনতার গ্লানি। এসবই এই ভিটে-মাটি হীন ছীন্নমূল মানুষদের সম্বল। তাই তারা মিশে থাকে। কোন টু শব্দটি উচ্চারণের স্বর নেই। থাকার কথাও নয়। যারা বুঝতে পারে পরিস্থিতির সঙ্গে তারা কোনক্রমে টিঁকে যায়। নইলে মৃত্যু নিশ্চিত। দয়ামায়া, করুণা, ভালোবাসার অপমৃত্যু ঘটে যায় এদেশে। তাই বাস্তব অনেক রূক্ষ এখানে। তা প্রাণঘাতী।

এ গল্পেও দেখা যায় সৌদামিনী, এক বিধবা, একটি ছোট ছেলে নিয়ে বাঁচার আশায় চলে আসে এপার বাংলায়। স্বামী মারা গেছে ও দেশেই। কেউ তার আপনার বলে আর নেই। জানি-জায়গা সব ছেড়ে নিঃস্ব হয়ে এসেছে সে। বয়স তার তিরিশ প্রায়। এদেশে এসে কোন এক চাল স্টেশনে উঠেছিল। সেখানে সুন্দরীর সাথে দেখা। সেই ওকে পাচারেদর বেআইনি ব্যবসার সন্ধান দেয়। নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে শেখায়। একাজ করতে সৌদামিনীর ইচ্ছে করে না। কিন্তু না করেও যে উপায় নেই। ঘরে ছোত একটি ছেলে। তার কথা ভেবেও করতে হয়। এ কাজে খুব সমস্যা চাল নিয়ে ট্রেনে উশে পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে নানান ঝক্কি সামলে তবে দোকানে বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া যায়।

সন্দরীর কথাতে বোঝা যায় ব্যবসা এখনো সৌদামিনী বোঝেনি। পঁচিশটাকার চাল চব্বিশ টাকায় দিয়ে আসে দোকানীকে। তবুও ঠিক আছে। শিখে নেবে সে। কিন্তু এদিকে হয়েছে আর এক সমস্যা। দিনকাল খুব খারাপ। পুলিশের আজকাল কড়া নজর। ফাঁকি দেওয়া কঠিন। তারও উপায় বার করে সুন্দরী। এমনভাবে দর্জির কাছ থেকে পোশাক বানিয়ে আনে যাতে ঐ পোষাকের ভিতরে করে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হল না। হাওড়া-শ্রীরামপুর - শ্যাওড়াফুলি জংশনের কোন কন বিশেষ বিশেষ স্টেশনে হঠাৎ হঠাৎই পুলিশ অনুসন্ধান চালাতে উঠে পড়ে ট্রেনের এক একটি কামরায়। বিশেষ করে যে কামরা গুলোতে সুন্দরী-সাদিয়ারা ধাকে নতুন পোষাক পরে এসেছে আজ ওরা চাল নিয়ে। খাকি পোষাক পরা লম্বা চওড়া দুজন লোক গাড়ির হাতল ধরে উঠে পড়ে ওদেরই কামরায় সঙ্গে মস্ত এক লাঠিধারী সেপাই। এক অফিসার বাতাসীর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে -

"চাল নিয়ে ভাগছিস শালী ! বার কর শীগ্‌গির।"

বাতাসী পায়ে পড়ে কাকুতি-মিনতি করতে থাকে। আর একজন বাতাসীর কাপড় চেপে ধরে। অন্যজন রিভলবারটা বার করে হাতের ওপর নাচায়। সৌদামিনী ট্রেনের চেন টানতে গেলে এক অফিসার হ্যাঁচকা টানে হাত নামিয়ে দেয়। সৌদামিনী প্রতিবাদ করে -

"তালি নামি যাও। যা পার ইস্টিশনে নাম্যে কর। পাঁচজন লোকের সামনে বিচার হোক - পুলিশে দাও হাজতে পোরো। তা না, চলন্ত গাড়িতে উঠে মেয়েগোরে কাপড় ধরে টানাটানি - একি চাল ধরা, না বজ্জাতি ?"

এ কথা শুনে এক অফিসার এগিয়ে আসে সৌদামিনীর দিকে। সৌদামিনী বুকের কাপড় শক্ত করে চেপে ধরে বিস্ফারিত চোখে পিছিয়ে যায়। সৌদামিনীর আঁচল চেপে ধরে বলে 'খোল্ কাপড়'। সৌদামিনী রাগে, ঘেন্নায় ঐ অফিসারের চুল ধরে শক্ত করে। অফিসার মাথা ছাড়তে পারে না। শেষে বুট দিয়ে জোরে সৌদামিনীর পেটে লাথি মারে। কোলা দরজা দিয়ে সৌদামিনী পড়ে যায়।

এ ঘটনায় সুন্দরীরা কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। অভিসম্পাত করে। এক সময় গাড়ি মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে। "কাঁদতে কাঁদতেই সুন্দরী মাথা তোলে, অফিসারদের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে পিচ্ করে থুথু ফেলে খানিক জানলা দিয়ে।" গাড়ি

টিপ্পনী

থামতেই দু'জন অফিসার লাফিয়ে নামে। কিন্তু তারও আগে ওদের পথ। বন্ধ করে দাঁড়ায় যাত্রীদের একটা দল। কাছাকাছি ক্ষেতে মাঠে কাজে ব্যাস্ত কিষাণরাও ছুটে আসে কাস্তে হাতে করে। প্রতিরোধের প্রতিবাদের এই ইঙ্গিত দিয়ে গল্প শেষ হয়।

এমনই তো বাস্তব। অনেক সৌদামিনীর জীবন শেষ হয়ে যায় এভাবেই। সৌদামিনীর মৃত্যুর জন্য দায়ী কে ? তার একমাত্র ছেলের অনাথ হয়ে যাওয়ার পেছনে দাবি কে। রাজনীতির ফলে দেশভাগের জন্য উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে আসা নাকি এদেশে এসে পুলিশের পাশবিক অত্যাচারের শিকার হওয়া - কোনটা ? এই প্রশ্ন তুলে দিচ্ছেন সুলেখা সান্যাল এ গল্পে।

টিপ্পনী

কত স্বপ্ন ছিল সৌদামিনীর। ছিল এক মনখারাপ করা অতীত। স্বামী-সন্তান নিয়ে ছিল তার সুখের সংসার। এই কষ্টের সময়ে তার মনে পড়ে সে সব অতীত দিনের কথা -

> "উঠোনে ধান এনে ফেলত কার্তিক, নিজের হাতে সেই ধান ভেনে ঘর ভরে রেখেছে।"

আজ সে সব স্মৃতিমাত্র। মাঠে ক্ষেতে লাঙল চালানো, ঘামে ভেজা চকচকে চওড়া পিঠ চাষীকে দেখলেই মনে পড়ে কাফর্তিকের কথা। এখন তার চোখের জলই সম্বল। রাতে শুয়ে ভাবে -

> "দ্যাশ কই ? এ কনে আলাম আমি !"

এ উচ্চারণ এ গল্পের সার। অচেনা অজানা বিদেশ বিভূঁই -এ তার আপনজন কেউ নেই। সুবলসখা নামের এক চালদোকানী নতুন করে সংসার পাতার প্রস্তাব দিয়েছিল সৌদামিনীকে, প্রথমে তার সংস্কারের বাঁধলেও। পরে সে স্থির করে ফেলেছিল যে সে সুবলসখার সঙ্গেই সংসার করবে। কিন্তু আর তার সেখানে পৌঁছে নিজে মুখে সম্মতি জানানোর সুযোগই হল না।

গল্পটীর নামকরণ ব্যাঞ্জনাধর্মী । সৌদামিনী বেআইনি চালের ব্যবসাটাকে ঘেন্না করতো। এপার বাংলার মানুষ ওপার বাংলার মানুষদের ঘেন্না করে বাঙাল বলত। পুলিশের অত্যাচারকে সৌদামিনী ঘেন্না করতে। সুন্দরীও ঘেন্নায় থুথু ফেলেছিল। সবমিলিয়ে পরিস্থিতিই হয়ে উঠেছিল ঘেন্নার। লেখক এক জটিল সময়ের কথা, রাষ্ট্র ব্যবস্থার অমানবিক যন্ত্রতার কথা তুলে ধরেছেন এ গল্পে। শিল্প সার্থক হয়ে উঠেছে এ গল্প।

প্রগতি : সুচিত্রা ভট্টাচার্য

টিপ্পনী

সুচিত্রা ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্যের একজন প্রগতিশিল কথাকার। ভাগলপুরে মামাবাযিতে ২৫ শে পৌষ ১৩৫৬ সনে ইংরেজি ১০ জানুয়ারী ১৯৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিত্রালয় ছিল মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে। স্কুল ও কলেজ জীবন কেটেছে দক্ষিণ কলকাতায়। কলেজে পড়াকালীন সংসারজীবনে প্রবেশ আবার কলেজে পড়তে পড়তেই চাকরীজীবনে প্রবেশ। বিভিন্ন স্থানে চাকরী করার পর তিনি সরকারী চাকরীতে যোগ দেন। সাহিত্য চর্চায় সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করার জন্য ২০০৪ সালে সে চাকরিতে ইস্তফা দেন। বিশ শতকের সত্তরের দশকের শেষ দিকে ছোতগল্প ও আশির দশকের মধ্যভাগ থেকে উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে নারীজীবনের শোষণ ও বঞ্চনাজনিত তীব্র ক্ষোভ ও শ্লেষ।আধুনিক সমাজের নারীরাও যে নানান সামাজিক, অর্থনৈতিক চাপে পিষ্ট হচ্ছে, তাদের সেই যন্ত্রণা, চোখের জল তাঁর লেখনীকে স্বতোৎসারিত করেছে। সময় ও সমাজের প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান ও তার বৈশিষ্টভ তাঁর লেখাকে জীবন্ত করে তুলেছে। প্রকাশের ভঙ্গীর মধ্যেও রয়েছে স্বতঃস্ফূর্ততা, গদ্য ও হয়ে উঠেছে কাব্যসুষমাময়।

তাঁর প্রকাশিত ছোটগল্প সংকলন হ'ল - 'অন্য অনুভব', 'খাঁচা', 'ময়না তদন্ত' ইত্যাদি।

আমরা এখানে আলোচনা করবো তাঁর রচিত গল্প 'প্রগতি'। প্রথমে আমরা গল্পটি সংক্ষেপে বুঝে নিতে পারি। গল্পটি শুরু হয় পাত্রী দেখাকে কেন্দ্র করে। তিনটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ গল্পটিতে দেখা যায়, প্রবল পরাক্রমশালী দারোগা নিশিকান্তবাবু নিজের মার্চেন্ট অফিসের কেরানির ছেলের জন্য পাত্রী সুহাসিনীকে দেখতে এসেছে। সুহাসিনী দশম শ্রেণি উত্তীর্ণা। পাত্রী দেখান সমাপ্ত। নিশিকান্ত দারগা এবার পাওনা-দেনার কথা বললেন -

"নগদ পঁচিশ হাজার, সোনা পঁয়তাল্লিশ ভরি ..... আর যা যা দেওয়ার ..... পালঙ্ক শয্যাবস্ত্র দানসামগ্রী ....."

এগুলি শুধু চাইলেনই না সঙ্গে এই বললেন -

"এসন মাল দেবেন না যাতে পাঁচজনের কাছে নিশি দারোগাকে খেলো হতে হয়। লোকে যেন না বলে ভিকিরির ঘর থেকে মেয়ে নিয়ে যাচ্চি।"

এমনিতে সুহাসিনীর বাবার গলা শুকিয়ে আসছিল তার ওপর এমন অপমান - সে

টিপ্পনী

এক ভয়ানক চাপ। তাই সুহাসিনীর বাবা নগদ টাকাটা একটু কমাতে অনুরোধ করেছিলেন। এও বলেছিলেন সুহাসিনী শান্ত, গৃহকর্মনিপুণা গুণবতী। তার মতো মেয়ে ভূভারতে নেই। লিখতে পড়তে জানে, সেলাই ফোঁড়াই এ পারদর্শী, গানের গলা চমৎকার। এসব কোন গুণপনার কথা আমল দিলেন না নিশি দারোগা। উল্টে আরো অসম্মানসূচক কথা বললেন -

> "গায়ের রঙটাও তো দেকেচি। নিশিকান্ত নির্লজ্জের নায় হাসিলেন,নিশি দারোগাকে আপনি সস্তায় ভুসোকালি গছাতে চান? হা হা হা।"

এই পর্যন্ত গল্পের একটি অংশ। এরপর শুরু হয় দ্বিতীয় অংশ, নতুন গল্প। বিষয় সেই এক। পাত্রি দেখা। পণ চাওয়া। এবার পাত্র আবগারি দপ্তরের মাঝারি অফিসার সঞ্জয়বাবুর ছেলে এম বি এ করা মাল্টি ন্যাশনালে কর্মরত রণজয়। পত্রী সুমিতা। জুলজিতে পি এইচ ডি। চাকরি পায়নি। বয়স তিরিশষ। গায়ের রং কালো। তেমন রূপসী উর্বশীও নয়। কিন্তু ওভার কোয়ালিফায়েড। মেয়ে দেখার পর্ব শেষ। সুস্মিতার বাবা সঞ্জয়বাবুর কাছে 'ডিসকাস' করতে চান। সঞ্জয়বাবুই মুখে বলেন দেনাপাওনা সংক্রান্ত মধ্যযুগীয় সিস্টেমে সে বিশ্বাস করে না। বলেই এবার মনের কথাগুলো বার করতে থাকেন। বেশ আড়াল করে করে বিশাল পরিমাণে দ্রব্যাদি চেয়ে বসেন ছেলের জন্য। ভারীন গয়না,আলমারি, সেপারেট ওয়ার্ড্রব, টিভি, এক সেট করে ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিজ মানে তিনশো লিতারের, বক্স খাট, মোটর সাইকেল - এত বড় লিস্ট পণের।

এত বড় চাহিদার কথা শুনে সুস্মিতার বাবা খুব রেগে যান কিন্তু প্রকাশ করতে পারেন না। মেয়ের কথা ভেবে। গায়ের রঙ, বয়স, ওভার কোয়ালিফায়েড - এসব কথা ভেবে কিছু বলতে পারে না সঞ্জয়বাবুকে। গল্পের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শেষ হয় এখানে।

তৃতীয় তথা শেষ পরিচ্ছেদটি মাত্র দুটি লাইনের। সুচিত্রা লেখেন -

> "সুস্মিতা কাঁদছিল। সুআসিনীও কেঁদেছিল।
>
> সুহাসিনীর পৌত্র সুস্মিতার ঠাকুরদা। সুহাসিনী সুস্মিতায় প্রায় একশো বছরের ব্যবধান।"

অর্থাৎ একই বিষয়কে সামনে রেখে সুচিত্রা ভট্টাচার্য চারটি প্রজন্মককে তুলে ধরেছেন। পণপ্রথা কেন্দ্রিক সমস্যাকে দুটো সময়ের ঘটনাকে দিবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। এই গল্পের বিষয় নতুন নয়। বলার ভঙ্গিটিও খুব আশ্চর্যজনক কিছু নয়। একটা সমস্যাকে হালকাচালে বলে শেষে একটু চমক দেবার চেষ্টা করেছেন তিনি।

আমাদের দেশে বিয়েতে পণ দেওয়া নেওয়ার সমস্যা আজও রয়েছে। এই

বিষয়টিকে অতিসরলীকরণ করে গল্পে তুলে ধরেছেন। দুটো সময়কে বোঝাতে লেখক দুইরকম ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। বিশ শতকের শুরুর দিকে কেমন ভাবে পাত্রের পিতারা সরাসরি নির্লজ্জভাবে পণ চাইতেন তা বোঝাতে গিয়ে লেখক নিজে যেখানে যেখানে বর্ণনা করেছেন তা সাধু ভাষায়।

প্রশ্নমালা :

টিপ্পনী

১. পেনেটিতে গল্পটি শিশুসাহিত্য হিসেবে কতটা মনোগ্রাহী আলোচনা করো।

২. তিমিরসম্ভবা গল্পটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

৩. অন্তঃসলিললা গল্পটির প্রধান চরিত্রের নাম কি ? তার চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

৪. আইন গল্পটিতে অবক্ষয়িত সময়ের যেকদর্য ছবি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

৫. পত্র পরিচিতা গল্পের চরিত্র ও লেখিকার চরিত্র মিলেমিশে একাকার আলোচনা কর।

৬. ঘেন্না গল্পে দেশভাগের যে যন্ত্রণার কথা ধরা পড়েছে তা আলোচনা করো।

৭. দ্রৌপদী গল্প রাষ্ট্রযন্ত্রের এক বীভৎস নগ্নতাকে তুলে ধরেছে, আলোচনা করো।

৮. নারীদদের দুই প্রজন্মের পরাধীনতার চিত্র হল 'প্রগতি' গল্পটি, আলোচনা কর।

টিপ্পনী

একক -৪ :উপন্যাস - সুবর্ণলতা

আশাপূর্না দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনকথা :

টিপ্পনী

উত্তর কলকাতার পটলডাঙায় ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২৪ শে পৌষ (ইং - ১৯০৯ সালের ৮ জানুয়ারী) মাতুলায়ে, একান্নবর্তী মধ্যবিত্ত পরিবারে আশাপূর্ণ দেবী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের আদি বাসস্থান ছিল হুগলী জেলার বেগমপুরে। সেখান থেকে পরে উত্তর কলকাতায়, বৃন্দাবন বসু লেনে গুপ্ত পরিবার বসবাস শুরু করেন। বাবা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। সে যুগের জনপ্রিয় বাংলা পত্রিকাগুলিতে ছবি আঁকতেন তিনি। মা সরলামুখী দেবী ছিলেন অত্যন্ত বিদূষী মহিলা, সাহিত্যপাঠে তাঁর ছিল খুব আকর্ষণ। তবে বাড়ির সর্বময়কত্রী ছিলেন আশাপূর্ণার ঠাকুমা নিস্তারিনী দেবী। তাঁরই কঠোর নির্দেশে গুপ্ত পরিবারের মেয়েদের বিদ্যালয় নির্ভর শিক্ষার পথ বন্ধ হয়ে যায়। কাজেই সাড়ষে পাঁচ বছর বয়সেই আশাপূর্ণা দেবীকে কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়নি। পরিণত আশাপূর্ণার স্মৃতিপটে ছেলেবেলার ছবিটি খুবই স্পষ্ট -

> "উত্তর কলকাতার একটি সরু গলির ধারে অতি মাঝারি একটি পুরোনো বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে আমার ছেলেবেলাটি আছে বন্দী হয়ে। ..... ঠাকুমার পাঁচ ছেলে পাঁচ বৌ, ঘর পিছু অন্তত জনা পাঁচ সাত সেনাবাহিনী। এছাড়া তাঁর আট মেয়ের মধ্যে দু-চারজন তো আছেনই সবসময়। তাঁদেরও সৈন্যসামন্ত। মস্ত একটি তুতো সাম্রাজ্যের মধ্যে বসবাস।"

এমন শিশুকন্যার ছেলেবেলাটি বেশ বিস্ময়কর। স্বভাসিদ্ধ পুতুল খেলা কিংবা হেঁশেল ঘরের প্রাথমিক সংস্করণ ছেড়ে তাঁর মনোযোগ কেড়েছিল 'বেশ কিছু খালি দেশলাইয়ের খোল, খালি সিগারেটের টিন, খালি সাবানের বাক্স, দোলের দরুণ টিনের পিচকিরির খালি চোঙ ; এবং কোথা থেকে না কোথা থেকে জড়ো করা টুকরো টুকরো কাঠ। এবং ছাতেই তার কারখানা। যেখানে হরদমই কিছু তৈরি হচ্ছে। একটা ভেঙে আর একটা'। শৈশবের সেই তুচ্ছ খেলার সামগ্রীর ভাঙা গড়ার খেলার মধ্যেই কি লুকিয়েছিল কোন ভবিতব্যের ইঙ্গিত ? ছেলেবেলার সেই কারখানার সামগ্রীর বদলে ভবিষ্যতের কারখানায় চলেছিল সাহিত্য গড়ার কাজ। সেখানেও চেনা-অচেনা মানুষের মুখ মুখোশের দ্বন্দ্বকে চিনে নিয়ে অবিরাম ভাঙা - গড়া চলেছে। মানুষের এই বিচিত্র

জীবনছবি তাঁর মনকে আমৃত্যু নানাভাবে স্পর্শ করে গেছে। চেনা - অচেনার স্ববিরোধী দ্বন্দ্বে তিনি লক্ষ্য করেছেন - 'যাদের - চিনি জানি বলে মনে করা যাব, তারা কি সত্যিই চেনা ? বিচিত্র চরিত্র এই মানুষ জাতটাকে কে কবে চিনেছে ? এ কত উল্টেপাল্টা উপাদান দিয়েই তৈরি। এর মধ্যে কত রঙ, কত লীলা, কত বিস্ময় ! সে নিজেই জানে না। কী জন্যে কী করে বসে। জানে না তার চেতনে অচেতনে কোথায় কি আছে, তার 'মন' নামক বস্তুটা কী জটিলতার জালে আবদ্ধ।'

টিপ্পনী

প্রথাগত স্কুলের শিক্ষা তাঁর ভাগ্যে ছিল না । কারণ তখন তো মেয়েদের পড়াশুনো করা একটা অপরাধ। স্বাভাবিক শিক্ষার পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উল্টো পথেই শুরু হয়েছিল তাঁর সাধনা। অদম্য সে সাধনা। মেঝেতে মাদুর পেতে দুই দাদা তারস্বরে পড়া মুখস্থ করছেন, আর শিশু আশাপূর্ণা তাঁদের সামনে বসে বইয়ের ওপর ঝুঁকে একবার লেখাটা দেখে নিচ্ছে। এই অদ্ভূত খেলায় তাঁর মায়ের পরোক্ষ সমর্থন ছিল। কেননা দস্যিপনাকে শান্ত করার এও তো এক সহজ মাধ্যম। উঁচু জানলার ধাপে বসে বই পড়তে পড়তে অন্য এক জগতে বিচরণ এক বিচিত্র 'জীবনের পটভূমিকায়' সাহিত্যের সঙ্গে প্রথম সাহিতত্ব গড়ে উঠেছিল আশাপূর্ণার । পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে 'নিদারুণ অপরিচয়' সত্ত্বেও মায়ের সাহিত্যপ্রীতির অফুরন্ত অবকাশে 'অপাঠ্য পুস্তক গলাধঃকরণের অখন্ড অবকাশ' ছিল তাঁর । এভাবেই নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রাথমিক পাঠের মহড়া সেরেছিলেন আশাপূর্ণা। এরপর এক অভাবনীয় কাজ করে ফেলেছিলেন আশাপূর্ণা। 'বাড়ির কাউকে না জানিয়ে 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' এর নামে একটি চিঠি লিখে প্রেরণ করেছিলেন। উত্তরও পান যথাসময়ে। এবার একদিন 'দুম করে একটা কবিতা লিখে ফেলে পাঠিয়ে দিলেন একটা পত্রিকায়। সেটাই ছাপা হল। প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম কবিতা। 'শিশুসাথী' পত্রিকায় প্রথম কবিতা 'বাইরের ডাক' বেরোয়, সেটা ছিল বাংলা ১৩২৯ সন । এই পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরাজকুমার চক্রবর্তীর অনুপ্রেরণার কথা পরবর্তি পর্যায়ে আশাপূর্ণা বারবার উল্লেখ করেছেন । এভাবেই একদিন সত্যিকারের লেখার জগতে পা ফেলেছিলেন তেরো বছরের আশাপূর্ণা । এরপর লিখলেরন প্রথম গল্প 'পাশাপাশি' । 'মৌচাক', 'রংমশাল', 'খোকাখুকু' প্রভৃতি শিশুদের পত্রিকায় তাঁর বেশকিছু লেখা প্রকাশ পায়। এসবের মধ্যেই তার বিয়ে হয়। চলে যান কৃষ্ণনগরে শ্বশুরবাড়ি।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

দুই পুত্র কন্যার জননী হয়ে সাংসারিক সকল দায়িত্ব সামলেও চালিয়ে গেছেন তাঁর লেখালিখি। বড়দের জন্য প্রথম উপন্যাস লেখেন ১৩৫১ সনে। 'প্রেম ও প্রয়োজন' নামের উপন্যাসটিও অনুরোধের ফসল। 'বিশু মুখোপাধ্যায়ের প্রেরণায় ও তাগিদে লেখা

। এখানে অবশ্যই উল্লেখ যে বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে শ্বশুরবাড়িতে লেখালেখি খানিকটা ব্যাহত হয়েছিল। স্মৃতিকথায় তিনি বলেছেন সে কথা -

> "..... মেয়েদের পক্ষে তো আর শ্বশুরবাড়ি জায়গাটা কুসুমকোমল নয়। তাছাড়া সে তো আবার পিতৃগৃহের 'পর্দার' থেকেও অনেক ঘোরালো। স্রেফ লৌহ যবনিকার অন্তরাল। কিন্তু সবচেয়ে অসুবিধে ঘটেছিল মফস্বলের শ্বশুরবাড়িতে বইয়ের অভাবে।"

তবু একথাও ঠিক স্বামী কালিদাস গুপ্তের সহযোগী সাহচর্য তাঁকে প্রানিত করেছিল। নানান সাংসারিক সমস্যার মধ্যে দিয়েও। ১৯৪৪ সাল থেকে তাঁর লেখা স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় প্রকাশিত হয়। ৬০ থেকে ৯০ এর দশকে শুধু প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা দাঁড়ায় 'একশত ঊনআশিতে'। তাঁর বেশিরভাগ লেখাই বিশ শতকের শুরুতে মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাঙনের সাক্ষী হয়ে থেকেছে। তবে একক সমস্যা, একক অস্তিত্বের নিঃসঙ্গ আত্মজিজ্ঞাসাও কোন কোন উপন্যাসে উঠে এসেছে। ত্রয়ী উপন্যাসের প্রথম দুটি ছাড়া 'যোগবিয়োগ' (১৯৫৩), 'উত্তরলিপি' (১৯৬০) 'উত্তরণ" (১৯৬৪), 'মিত্তিরবাড়ি' (১৯৪৭), 'অবগুণ্ঠতা' (১৯৬৭) -র মতো উপন্যসগুলো যেমন মধ্যবিত্ত ভাঙনের রূপকার আশাপূর্ণার বয়ানকে অকপট সারেল্য তুলে ধরেছে, ঠিক তেমনি 'উন্মোচন' (১৯৫৭), 'সোনার হরিণ' (১৯৬২), 'অতিক্রান্ত' (১৯৫৭) -র মতো উপন্যাসের প্রেক্ষণ বিন্দু বিস্তৃত প্রেক্ষাপট ছেড়ে একক সমসা কেন্দ্রাভিমুখী হয়েছে।

উপন্যাসের পাশাপাশি প্রায় ৩২ টি ছোটগল্প সংকলন এবং ৪৯ টি ছোটদের বই প্রকাশিত হয়। কিন্তু যে তিনটি রচনা বাংলা সাহিত্যে আশাপূর্ণা দেবীকে স্থাবী প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল, সেই তিনটি উপন্যাসের অক্ষয়কীর্তির কথা আলাদাভাবে আলোচনা করবার দাবী রাখে। সেই তিনটি উপন্যাস হল - 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' (১৯৬৪), 'সুবর্ণলতা' (১৯৬৭) ও 'বকুল কথা' (১৯৭৪)। বৃহৎ দেশকালের প্রেক্ষাপটে যৌথ পরিবারের আভিজাত্যের মিথ্যে জৌলুষে ভেঙে যাওয়া তিন প্রজন্মের তিন নারীর পুতুল সংসার - যেখানে তিনটি নারী তার নিজের জন্য একান্ত গোপন কক্ষটুকু খুঁজে নিতে প্রয়াসী - তারই যেন ছবি আঁকলেন আশাপূর্ণা তিনটি আলাদা আলাদা প্রেক্ষিতে। 'মেয়েদের অধিকারহীনতা, অন্যায় অবরোধ ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান প্রত্যাশী লেখক তিন যুগের পৃষ্ঠপটে বসে তিন কন্যার আপন গাথা রচনা করলেন। তখন অবশ্য তিনি থাকতেন ১৭, কানুনগো পার্ক, গড়িয়ার নিজস্ব বাড়িতে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বহু সম্মানে তিনি ভূষিত হয়েছেন। ১৯৫৪ সালে 'লীলা পুরস্কার' - এর মধ্যে দিয়ে পুরস্কার প্রাপ্তির শুভ সূচনা। তবে জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তির জন্য শ্রেষ্ঠ মূল্যায়ন ঘটে যখন তিনি 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের জন্য 'রবীন্দ্রস্মৃতি' পুরস্কার এ (১৯৬৬) এবং 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার - এ (১৯৭৬) ভূষিত হন। এছাড়া তিনি একে একে ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২), ভুবনেশ্বরী পদক (শিশুসাহিত্য পরিষদ, ১৯৭৬), 'হরনাথ ঘোষ পদক' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮৮), 'শরৎ পুরস্কার' (১৯৮৯), জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩) অর্জন করেন। ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' খেতাবে ভূষিত করে ১৯৭৬ সালে। তার পর যথাক্রমে জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৩) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৭), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৮) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯০) তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেট প্রদান করে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে 'দেশিকোত্তম' (১৯৮৯) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৯৪ তে সাহিত্য আকাদেমির ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৯৫ সালের ১৩ জুলাই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ও ত্যাগ করেন।

সুবর্ণলতা' উপন্যাস সম্পর্কেএকটি সাধারণ ধারণা :

একটি বিশেষ কালের আলেখ্য রচনা চেয়েছেন আশাপূর্ণাদেবী তাঁর 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে। আর তা করতে গিয়ে তিনি যেন একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে প্রায় প্রচ্ছন্ন অতীতকে বাঙ্ময় করে তোলেন। দোলায়িত আত্মজিজ্ঞাসায় অধীর হয়ে ওঠেন। কল্পিত মানসী সত্যবতীর পরবর্তী প্রজন্মের কথা বলতে গিয়ে আসলে বলেন আবাল্য দেখা নিজেরই কাল - স্মৃতির কথা, যার ছায়া আজও সমাজের আনাচে-কানাচে তার ছাপ ফেলে রেখেছে। আশাপূর্ণা বলতে চান অসূর্যস্পশ্যা অন্তলোকবাসিনীদের অপূর্ণতার কথা। সুবর্নলতার আখ্যানে তাই উঠে আসে অন্তঃপুরের সেই দৃশ্য, যেখানে সত্যবতীর পরবর্তী প্রজন্ম হয়েও সুবর্ণলতা এমন এক পরিবারের মেজ বৌ, যাকে সবসময় বোঝানোর চেষ্টা চলে আত্মপরিচয়ের চেয়েও বড় হল মেজ বৌ - এর আবরণী সত্তা। আর সেই দর্জি পাড়ার বাড়ির মেজ বৌ এর দায় মেটাতে নয় বছরের সুবর্ণের যে শ্বশুরবাড়িষর চোকাঠ পেরোতে হয়েছিল, তারপর থেকেই তার সমস্ত জিজ্ঞাসাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে দর্জিপাড়ার শ্বশুরবাড়ির কিছু অলিখিত নিয়ম - যার কর্ত্রী ছিলেন মুক্তকেশী। মুক্তকেশীর নিয়ম-নীতিই সে বাড়ির বেদবাক্য। তাঁর নীতিবাক্য ছিল এমন -

'বেটাছেলের আবার কিছু দোষ আছে নাকি ? মেয়ে মানুষকেই

সবকিছূ মেনে শুনে চলতে হয়।"

কিন্তু সুবর্ণলতা এই কথাকে পরমবাক্য ধরে নিয়ে চলতে চায় না । তাঁর আত্মমর্যাদায় বাধে। কাঁচার পোআখির মত তাই সে ছটপট করে যন্ত্রণায়।

আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' যদি খাঁচা ভেঙে ফেলার দুঃসাহসিক অভিযান তবে 'সুবর্ণলতা' কে বদ্ধ খাঁচার অব্যক্ত যন্ত্রণার মুক্তিকামী বাসনার প্রকাশ বলা যেতে পারে । সত্যবতীর এক প্রজন্মের পরের হয়েও সুবর্ণলতাকে ঘিরে রেখেছে দাসত্বের ধাতববলয়, যে বলয়কে ভেঙ্গে ফেলার ব্যার্থ প্রয়াস করেছে সুবর্ণলতা বিবাহোত্তর পঞ্চাশবছর ধরে। তবুও একে ভাঙতে না পারার দীর্ঘ ব্যর্থতার মধ্যেও সুবর্ণের আত্মসত্তআকে বাঁচিয়ে রাখার সামান্য সফল প্রয়াস হচ্ছে ঔপনিবেশিক অবস্থাকে শনাক্ত করে এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলা । তবে সত্যবতীর আখ্যানে যেমন একটি একপেশে মানসিক জয়ের আনন্দ আছে, সত্যবতী যেমন আপন ব্যাক্তিত্বের জোরে রামনকালী থেকে নীলাম্বর - প্রত্যেকর কাছেই একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র গন্ডি তৈরী করে নিয়েছে, সুবর্ণলতার যন্ত্রণাদগ্ধ আখ্যানে সেই সফলতার আনন্দ নেই; আছে খাঁচার মধ্যে বন্দীত্বের অণুভব করে সেই শৃঙ্খল মোচনের ব্যার্থ ডানা ঝাপটানোর শব্দ। সত্যবতী তার অস্তিত্বকে প্রত্যেককে মেনে নিতে বাথ্য করেছিল কিন্তু সুবর্ণলনতার জীবনের দুঃসহ বেদনা হচ্ছে তার অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেয় নি কেউ। তাই সে বলে -

> "আমি একটি নিরুপায় রঙ্গনাড়ি, আমার একমাত্র পরিচয় আমি একটি অন্ধপুরির মেজবৌ, আমার মন আছে বুদ্ধি আচে, মস্তুস্ক আচে, আত্মা আচে, কিন্তু কেহ আমার সত্মাকে শিকার করে .... না।

এই মুদ্রণ বিকৃতি কিন্তু একটি অন্ধকূপে গুমরে ওঠা নারীর আত্মানুসন্ধানের দীর্ঘশ্বাসকে ম্লান করতে পারে না। সত্যবতীর পরবর্তী প্রজন্ম হিসেবে সুবর্ণলতার পাঠক প্রগতির আরো একধাপ এগিয়ে থাকার চিত্রটিই আশা করে, কিন্তু 'সুবর্ণলতা'র লেখকের কাছে সুবর্ণর আত্মপ্রতিষ্ঠার চেয়েও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের কথাই বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে সময়ের পারম্পর্যসূত্রে। ছকে ফেলে ছক ভেঙে ফেলার মতো দুঃসাহস তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসের নায়িকাদের ছিল কিন্তু কোনো এক অজহমাত রক্ষণশীল দোটানায় কিংবা অস্তমিত উনিশ শতকের আভিজাত্যহীন অহঙ্কারের শেষ রেশটুকু ধরে সেই গন্ডীতে নারীর প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের মরণপন লড়াই এর করুণ দৃশ্য পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা লেখকের অভিপ্রেত ছিল।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে সবচেয়ে তীব্রভাবে যে সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হল সামাজিক বলয়ে থেকেও তাকে অস্বিকার না করেও নারীর আত্মিক দিক দিয়েমুক্ত নারী হয়ে ওঠার বাসনার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি অর্জনের ইচ্ছে। নয় বছরের সুবর্ণষলতা যেদিন বাবার নির্বুদ্বধিতায় ঠাকুমা এলোকেশির পরামর্শে আইবুড়োর ছাপ মুছে দিয়ে মুক্তকেশীর যৌথ পরিবারের মেজবৌ এর আসন নিল, সেদিন থেকে তার জীবনের সংগ্রামের অধ্যায়ের শুরু। নয় থেকে চৌদ্দ - এই ছবছরের তিক্ত অভিজ্ঞতায় সুবর্ণলতার স্মৃতি-বিস্মৃতির ভান্ডার ভরে আছে কিছু চাওয়া না পাওয়ার অপমান - অভিমানের তুকটাক কথায়। নয় বছরের সুবর্ণলতা যখন শ্বশুরবাড়ি আসে তখন তাকে বরণ করা হয়েছিল 'আয়ে তাড়ানো বাপে খেদানো' বিশ্লেষণে। সেই চয় বছরের অভিজ্ঞতা যেন সুবর্ণকে আরো ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল তার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে তার ভাবনা - মানসিকতার স্বতন্ত্রতাকে। তাই সুবর্ণলতা যেখানে দক্ষিণ বারান্দার খোলা পথে সভ্যতা-সংস্কৃতির মুক্ত প্রবাহের কথ ভেবে পুলকিত হয়, নিজের মনেইএকখানা নিজস্ব ঘরের কল্পনায় রোমাঞ্চিত হয়, সেখানে তার শ্বশুরবাড়ির লোকেদের কাছে বারান্দার অনাবশ্যকটুকু শুধুই বাহুল্যের স্বীকৃতি। ফলে মুক্তকেশী এবং তার অন্যান্য কন্যা - পুত্রবধূদের কাছে সেই বাড়তি চাওয়াটুকু তো আদিখ্যেতা। তাদের মন নিজস্ব বলে কিছু ভাবতেই পারে না। কেননা তাদের কাছে 'নিজস্ব'-র পরিচিত সংজ্ঞা হচ্ছে স্বামী-সন্তান-পরিবারের গন্ডিবদ্ধ নিরাপদ আশ্রয়, তাদের নিজের ধর্ম হচ্ছে পরিবারের সুখ-ইচ্ছার জন্য নিজের বেঁচে থাকা। আর তাই সুবর্ণলতার সামান্য চাওয়ার আস্বাদটুকুও উপলব্ধি করতে পারে না প্রবোধ। সুবর্ণলতার নিজস্ব গৃহকোনটুকু প্রয়োজন আত্মআবিষ্কারের জন্য যা মুক্তকেশীর পরিবারের পিতৃতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় বাস করা কোনো সদস্যদের কাছে অনভিপ্রেত। তাই দর্জিপাড়ার যে বাড়িতে সুদীর্ঘ ৩০ বছরের ধূসর দিনযাপনের অমূল্য স্মৃতি কাটিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল সুবর্ণলতা, প্রথম প্রবেশেই সে তার এই শূণ্যতাবোধের অদৃশ্য পিঞ্জরকে আবিষ্কার করেছিল অবিশ্বাসী প্রেমের দীনতায়, সুবণর্ণের কল্পিত বাস্তবে ছিল নিতান্তই সাজানো একটু স্বস্তির গৃহকোন কিন্তু রূঢ় বাস্তব তাকে উপহার দিয়েছিল -

> "খান চারেক ঘর, মাঝখানে টানা দালান, এদিকেওদিকে খঁোচা খোঁচা একটু একটু ঘরের মত, এরই মাঝখানে দিশেহারা হয়ে ঘুরপাক খায় সুবর্ণ, এদরজা ও দরজা পার হয়ে একই ঘনরে বার বার আসে বিমূঢ়ের মত বুঝতে পারে না কোন্ দরজা দিয়ে বেরোতে পারলে সেই গোপন রহস্যে ভরা পরম ঐশ্বর্য লোকের দরজাটি দেখতে পাবে।

ঘরে ফিরে তো শুধু দেয়াল

রিক্ত শূন্য খাঁ খাঁ করা সাদা দেয়াল,

উগ্র নতুন চুনের গন্ধবাহী।"

নারীর কাছে ঐশ্বর্যলোক মানেই তো তাকে জানানো হয়েছে তার স্বামী-সন্তান বেষ্টিত পরিবারের ছবি, এর চৌকাঠ নারীর জন্য এঁকে দিয়েছে আজন্মের লক্ষণরেখা। এরই ভেতর দিনের পর দিন ধরে দগ্ধ হতে হতে ভস্মীভূত হয়ে গেছে কত অস্ফুট অঙ্কুরের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। যুগে যুগে তার চারিদিকে গড়ে উঠেছে সংস্কারের যজ্ঞপিঞ্জর। 'না' - এই নেতিবোধের রিক্ততা নিয়েই নারী ভরে তুলেছে তার শূন্য বিবর।

মুক্তকেশীর দর্জিপাড়ার সেই তিনতলা বাড়িটি যেন সব ধরণের প্রগতির পরিপন্থী। তাই ছাদের সিঁড়িটুকু যেমন খরচের অকুলান বলেই অপ্রয়োজনীয় তেমনি মুক্তকেশীর বাড়িতে কেরোসিনের নতুন আলো প্রবেশের অধিকার নেই। আলো - হাওয়ার মুক্তপ্রবেশে বাধা সৃষ্টি করেই যেন সেই বাড়ি সংস্কারের বদ্ধরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুবর্ণলতা তা থেকে মুক্তি চেয়েছিল। নারীমুক্তি অর্থাৎ শুধু অন্দরের অরোধ মোচনের মুক্তি নয়, অন্তরের অবরোধের থেকেও মুক্তি। সে যেদিন দর্জিপাড়ার এই বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কহীন তিনমহলা বাড়িকেই তার অন্ধনিয়তি বে জেনেছিল সেদিনই কিন্তু তার ভেদরকার মুক্তি পিয়াসী মন মরে যায় নি, সে সঙ্কল্প নিয়েছিল আরো কঠিন ব্রতের -

" .....এদের মানুষ করে তুলতে ইচ্ছে করে সুবর্ণর। ইচ্ছে করে এরা শোখিন হোক, সভ্য হোক, রুচি পচ্ছন্দের মানে বুঝুক। এদের নিয়ে সুন্দর করে সংসার করবে সুবর্ণ।"

একটি মেয়ের সারাজীবনের সংগ্রামের মূল ভাববীজটি লুকিয়ে থাকে একটি সুপ্ত আদর্শের ভেতরে , যে আদর্শের আদর্শয়িত সুবর্ণলতা সম্পূর্ণ একটি অভব্য অমার্জিত অপরিশিলিত পরিবারকে পরিশিলিত করে তুলতে চায় যেখানে মেবেরা যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই বলা যাব মেয়েলীপাঠ্যের মূল সুর যে মেয়ে হিসেবে মানবিক মর্যাদার স্বাধীনতা সেটা কোনো পুরুষ বা পরিবারের বিরোধিতায় নয়। কারণ তার স্বভাব বৈশিষ্ট্যই হল, সে 'ভালোবাসে অন্য মেয়েদের, ভালোবাসে অন্য মেয়েদের, ভালোবাসে মেয়েদের সস্কৃতি, মেয়েদের আবেগ, এমনকি তার কান্নাকেও সেই সঙ্গে তার সামর্থ্যকে। ককনো বা ব্যাক্তিগতভাবে কোন পুরুষকেও ভালোবাসে, সেই মেয়ে; আর সে দায়বদ্ধ নারী পুরুষ নির্বিসেষে সমস্ত মানুষের বেঁচে থাকার জন্য তাদেদর

টিপ্পনী

সম্পূর্ণতার জন্য। আর সে কখনো বিচ্ছিন্নতাবাদী নয়, সে হলো বিশ্বমানবিক।'

কিন্তু সুবর্ণলতার বিশ্বাস বারবার তার নির্মিত প্রতিমাকে ভেঙে দিয়েছে, তাকে বিদ্রুপ করেছে। সুবর্ণলতা যেন তার নিজের অবস্থানগত উচ্চতা না বুজেই নীচতাকে মাপতে চেয়েছিল। তা না হলে যাদের 'বোধের জগৎটা' ভেন্টিলেটারহিন ঘরের মতো সেখানে 'চলমান বাতাসের এক কণা ঢুকে পড়তে পারে না, যাদের কাছে সংসারের প্রথম কন্যা সন্তানকে বরণ করা হয় 'আটির ঢিপি'র মতো তুচ্ছতায়, তাদের কাছে সুবর্ণলতার কোন মূল্যে ধার্য হবে ! 'সুবর্ণলতা'র লেখকের আপসহিন কণ্ঠে যেন বারবারই সেই আত্মমূল্যের সংজ্ঞা নির্ণীত হতে চেয়েছে। যেখানে সব ভাবনা ভালোবাসা সম্ভ্রমকে তুচ্ছে করে দিয়ে বড় হয়ে উঠেছে নারী জীবনের সবচেয়ে অবিসংবাদিত সত্যের এক ক্লেদাক্ত দিক, যেখানে সুবর্ণ শুধু এক অভ্যাসের মাধ্যম। কারন -

> "সুবর্ণেরমূল্য ধার্য হয়েছে শুধু একটা অভ্যাস মলিন শয্যায়। সেখানে সুবর্ণর জন্যে আগ্রহের আহ্বান অপেক্ষা করে। কিন্তু সে আগ্রহ কি প্রেমের ? সে আহ্বান কি পুরুষেদর ? তা নয়। সে শুধু অভ্যাসের নেশা। তাই সে আহ্বান সুবর্ণর চেতনাকে বিদ্রোহী করে, স্নায়ুদের পীড়িত করে, আত্মাকে জীর্ণ করে।"

চেতনার বিদ্রোহ, স্নায়ুর পীড়ন এবং আত্মার জীর্ণতা প্রতিটি সংলাপের সঙ্গেই খুব সূক্ষ্ম মাত্রায় জড়িয়ে আছে যে - বোধের উত্তরাধিকার, তা মন, ভালোবাসা। অনাকাঙ্খিত দাম্পোত্য জীবনের যেখানে সুবর্ণের স্বামীর সামন্য মানবিক ভালোবাসা হয়ো বা তার বেঁচে থাকার ভাবনাকে জাগিয়ে রাখতে পারতো। সেখানেও কামুক স্বামীর তিক্ত ক্লেদের শিকার সুবর্ণ প্রথম হারিয়েছিল তার স্বামীর প্রতি ভালোবাসার সম্ভ্রমবোধকে। আর যেখানে ভালোবাসার গাঁটছাড়া বাঁধা হয় না, সেখানে মনের বাঁধন সহজেই শিথিল হবে আসে। এই অবিশ্বাসী, অতৃপ্ত মনের আত্মকথই হয়ে উঠেছে সুবর্ণলতার জীবনের দুঃসহ উপলব্ধি -

> "ও আমায় বিশ্বাস করে না, আমিও ওকে বিশ্বাস করি না, ও নাকি আমায় ভালোবাসে, বলে তো তাই সবসময়, কিন্তু ভগবান, আমার অপরাধ নিওনা, আমি ওকে ভালবাসি না। ওকে ভালোবাসা আমার পক্ষে অসম্ভব। ওর সঙ্গে একবিন্দু মিল নেই আমার। তবু চিরদিন ওর সঙ্গে ঘর করতে হবে আমায়।"

টিপ্পনী

মনের গরমিল, বোধের গরমিলই সুবর্ণকে ভিড়ের মধ্যে একা করে দিয়েছিল ! লেখক যেন অন্তঃস্থলের গভীরে জমে থাকা বহু প্রশ্নের মালা গাঁথতে চান সুর্বের আত্মসংগ্রামের কাহিনীতে । কারণ সত্যবতীর নেপথ্যে লুকিয়ে আছে যে লেখকের ভাবনাপ্রসূত অন্তঃস্বর সেই বিশ্বাসের উপলব্ধিকেও তো ভুলে থাকতে পারে না পাঠক কুল। সুবর্ণলতার আখ্যানে আসলে মিশে আছে বঙ্গদেশের হাজারো নারীর খন্ডকথা যারা পূর্ণতার উপলব্ধির অনেক আগেই বিলীন হয়ে গেছে 'অসার্থক জীবনের গ্লানির বোঝা নিয়ে'।

টিপ্পনী

সুবর্ণর চেতনা বিদ্রোহ করেছিল ভাবনার বিশহবা সঘাতকতায়, স্নায়ু পীড়িত হয়েছিল অভ্যাসের কুশ্রীতায় আর আত্মা জীর্ণ হয়ে উঠেছিল প্রেমহীন জীবনের পৌরুষহীনতায়। সুবর্ণলতা চেয়েছিল প্রেমের আহ্বানে জীবনের সাদা পৃষ্ঠাগুলিকে রঙিন করে তুলতে । সে তার স্বামীকে ভালোবাসতে চেয়েছিল । সে চেয়েছিল অভিমান অপমানের আঘাতে স্বামীর অভ্যাসের নিশ্চেষ্টতাকে ভেঙে দিয়ে তার যথার্থ পৌরুষকে জাগিয়ে তুলতে । সুবর্ণ তার জীবনযুদ্ধে সর্বার্থেই চেয়েছিল এক সহযোদ্ধাকে, ভালোবাসার মানুষকে। কিন্তু সন্দেহপ্রবণ প্রবোধের কাছে স্ত্রী মানেই তো 'মেয়েমানুষ', সে মানুষ হতে পারে নি কখনো। আর তাই বোধহয় অবাধ্য জীবকোএ পোষ মানাতেই সে প্রতিরাতে ভোগের চাবুকে সুবর্ণলতাকে হার মানাবার ব্যার্থ চষ্টা করেছে, প্রেমের সৌরভে তাকে জিতে নিতে পারে নি। 'সম্বন্ধ যেখানে ভিতর থেকে সত্য, সেখানে বিবাহ না ধাকলেও সম্বন্ধ ভাঙে না; সম্বন্ধ যেখানে ভিতরথেকে মিথ্যে, সেখানে বিবাহ থাকলেও সম্বন্ধ থাকে না।' সুবর্ণলতার জীবনও তেমনই। প্রবোধ ও সুবর্ণলতার মধ্যে সত্যিকারেদর কোন সম্বন্ধই ছিল না। সুবর্ণলতা না চাইলেও বারবার তাকে আঁতুড়ঘরের মলিন শয্যায় যেতে হয়েছে প্রবোধের অভচাসের নেশাকে চরিতার্থ করতে । প্রবোধ যতই গায়ের জোরে সুবর্ণর ওপর সন্তানের বৈধ সম্পর্ক চাপিয়ে দিয়ে তার মতো করে এ সম্পর্ক কে ভালোবাসার সংজআ দিতে চেয়েছে, সুবর্ণের দিক থেকে আত্মিক রীতি এবং স্বামীর সুখ ভোগের ইচ্ছা মেটাতে গিয়ে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে কত নারীর আত্মিক ইচ্ছার শেষ রেশটুকুও । দাম্পত্য জীবনের প্রেমহীনতার ছবি যেকানে খুব সূক্ষ্মভাবেই জড়িয়ে আছে শরীরীন মিলনের সত্যটিও, আশাপূর্ণার ত্রয়ী উপন্যাসে এ দিকটা খুব স্পষ্ট না হলেও প্রচ্ছন্ন রাখেন নি। 'সুবর্ণলতা' -র পর লিখিত উপন্যাসে নারী চরিত্রের উত্তরোত্তর বিকাশের মধ্য দিয়ে সহজেই নারী প্রগতির স্পষ্ট রূপরেখা অঙ্কন করা যেত কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে হয়তো বা মধ্যযুগীয় শুচিতা রক্ষার দায়ে কিংবা রক্ষণশিল মনোভাবের

জন্য সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। যে আত্মিক বিশ্বাসের আত্মনির্ভরতায় সুবর্ণলতা নিজের মনকে সায় দিয়েই উচ্চারণ করে এইদুঃসাহসিক সংলাপ -

> "আমার ইচ্ছে হয় কেউ আমায় ভালবাসুক, আমি কাউকে ভালবাসি। জানি এসব খুব নিন্দের কথা তবু চুপি চুপি না বলে পারছি না - প্রেমে পড়তে ইচ্ছে হয় আমার। যে প্রেমের মধ্যে কবিবা জগতের সমস্ত সৌন্দর্য দেখতে পান, যে প্রেমকে নিয়ে জগতের এতকাব্য গান, নাটক ..... একটা শিশুকে ধরে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিলে, আর একটা বালিকাকে ধরে জোর করে, 'মা' করে দিলেই তার মনেদর সব দরজা বন্ধ হয়ে যাবে? যেতে বাধ্য?"

এখানে খুব স্পটত আশাপূর্ণা যেন সামজিক নিন্দের পরোয়া না করেই পাঠকের কাছে ফরমান জারি করে বসেন তার বাধ্যতা - অবাধ্যতা বিচারের। আত্মপক্ষকে জোরালো করতেই যেন সমর্থন আশা করেন বাল্যবিবাহ এবং অপরিণত মাতৃত্বের প্রসঙ্গ তুলে ধরে। সুবর্ণলতার জীবনেএই অসম্পূর্ণতা গুলো আরো প্রকট ধরা পড়েছিল জয়াবতীর বর্ণাঢ্য দাম্পত্য সম্পর্ক, সুবালার সুখী সংসারের ছবি এবং অম্বিকার ব্যাক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসেই। প্রবোধের সুশ্রী দেহের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা ভবানক কুশ্রীতাকে সুবর্ণ ঘৃণা করেছে আর 'রোদে পোড়া রুক্ষ্ম কালো শীর্ণ অম্বিকাকে দেখে তার মনে হয়েছে 'উঁচুস্তরের মানুষ'। তার সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে 'তার মত মানুষের ধারে কাছে থাকতে আপনিই বিশুদ্ধ হয়ে যায় মানুষ'।

এভাবে মনের অমিলকেই একমাত্র ভরসা করে এগিয়ে গেছে সুবর্ণলতা। পথ চলতে চলতে হয়ত নুয়ে পড়েছে কিন্তু ভেঙে পড়েনি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অনমনীয় ব্যাক্তিত্বকেই আশ্রয় করে বেঁচে গেছে। চলে যেতে যেতেই যেন পরবর্তী প্রজন্মের উদ্দেশ্যে বলে গেছে সেই কঠিন ব্রতের সহজ সমাধানটি 'এরেছি, কিন্তু হার মানি নি।'

সুবর্ণলতার এই অপূর্ণ আখ্যান জন্ম দিয়ে গেছে অনেক সম্ভাব্য প্রশ্নের। লেখকের বলিষ্ঠ এবং দরদী লেখনি সুবর্ণলতার আত্মবলীদানের ভাষায় যেন নারির নিজস্ব নির্মিতির এক একান্ত অবস্থানটুকু তৈরী করে নেওয়ার ছক ভাংআয় প্রয়াসী হয়ে উঠেছে। সুবর্ণলতার পূর্বপ্রজন্ম অর্থাৎ সচত্যবতী অবিশ্বাস্য দাম্পত্যজীবনের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বেদনা নিয়ে সংসার - ত্যাগী হয়েছিল। সেই সংসার ত্যাগী মায়ের জীবনাদর্শ সুবর্ণের

টিপ্পনী

জীবনতরীকেওন ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আপাত অর্থে যদিও জীবন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে দুটো জীবনের মধ্যে বিরোধাভাসের একটা আবস্থানগত বৈষম্য লক্ষ করা যায়, এই পার্থক্যও কিন্তু দুই প্রজন্মের মুক্তির আদর্শকে বিলুপ্ত করতে পারেনি। সত্যবতীর প্রেরিত চিঠি সুবর্ণের কাছে নারীজীবনের এক আমোঘ সত্য বিবাহ প্রতিষ্ঠানের যৌক্তিকতাকে তুলে ধরেছিল প্রথাগত নীতির বিরোধিতায় । আর সুবর্ণ সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি বিধিবিধানের সক্রিয় অভিজ্ঞতার বাহক ছিল । সুবর্ণলতা স্বামী সহবাসে আবিষ্কার করেছিল তার যন্ত্রণার তীব্রতাকে, পরিচিত মহলের চেনা নৈকট্যের মধ্যে থেকেও অনুভব করেছিল, শূণ্যতাবোধের হাহাকারকে । একই ছাদেদর নিচে একই শয্যার আশ্রয়ে শুয়েও সে খুঁজে পেয়েছিল স্বামী সন্তানদের থেকে পৃথক মননের গভীরতার স্বাদকে । আর দীর্ঘ বৈপরীত্যের ডালি নিয়েই একদিন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল তার না - পাওয়ার অভিযান। তাই সুবণর্ণলতার চিতার লেলিহান শিখাও যেন অপূর্ণতার আর্তনাদে জ্বলজ্বল করে উঠেছে। এই শিখার আভার উজ্জলতাকে বঙ্গদেশের হাজারো সুবর্ণের জীবনে ছড়ীয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হয় সুবর্ণের শেষ জীবনের সন্তান বকুল।

আসলে সুবর্ণর এই আখ্যান যেন নারীর নিজস্ব অভিজ্ঞানের পরিধিটিকে আরো স্পষ্ট করে তোলে। স্ত্রীশিক্ষা স্বাধীতে অর্থাৎ নারী প্রগতির জোয়ারে যখন শিক্ষিত ব্রাহ্ম পরিবারের মধ্যেও মাঝে মাঝে বিরোধিতার তরঙ্গ উঠেছিল তখনও কিন্তু গ্রাম বাংলার হাজারো অন্দরমহল অমনিশায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। ঠিক তখনই সুবর্ণলতার আত্মনির্মিতির ইতিহাস লেখকেদর জাগ্রত চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। অভিজাত্যহীন অহংকারের ধ্বজাধারী রক্ষণশীল বাড়ির মেজবৌ - এর জাগ্রত চেতনা যেন অহংকারের ধ্বজাধারী রক্ষণশীল বাড়ির মেজবৌ এর জাগ্রত চেতনা যেন পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছে । আর সুবর্ণলতার স্রষ্টা আশাপূর্ণার কাছে নারী প্রতির পরবর্তী অধ্যায়কে জানার আগ্রহ পাঠককুলকে মোহাবিষ্ট করে রাখে।

সুবর্ণলতা' উপন্যাসের অন্তঃস্রোত :

তখন সময় বিশ শতকের চারের দশক। দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা-দেশভাগ-নানা আন্দোলন আর উদ্বাস্তু স্রোতে ভারতবর্ষের নতুন এক ইতিহাস রচিত হচ্ছে। এমন এক প্রেক্ষাপটে এক নতুন যুগ ও ব্যাতিক্রমী উপস্থাপনা নিয়ে লেখালিখির জগতে এলেন আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯ - ১৯৯৫) । যাঁর সাহিত্যজীবন সুদীর্ঘ। প্রায় সাতটি দশক ধরে তিনি লিখে গেছেন । অনেক রচনা, অনেক সম্মান সবই তিনি পেয়েছেন কিন্তু অমর হয়ে রয়েছেন তাঁর বিখ্যাত ট্রিলজি

টিপ্পনী

টিপ্পনী

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'; 'সুবর্ণলতা' ও 'বকুলকথা'র জন্য।

আনশাপূর্ণাদেবীর সাহিত্যভাবনার মূলে রয়েছে মেয়েরা। 'মেয়েদের সবকিছুত এই এমন অধিকারহীনতা কেন? তাদের উপর অন্যায় - অবিচারের জাঁতা চাপানো কচেন? তার জীবন অবরোধের মধ্যে কেন? এত 'কেন'ই তাঁকে বিবরত করেছে। এই 'ককেন' গুলোর উত্তর খুঁজতে চেয়েছেন তাঁর সাহিত্যে। 'বকুলকথা' উপন্যাসে অনামিকা দেবীর বাচনে যা থাকে তা তো আশাপূর্ণারই নিজস্ব উপলব্ধিজাত উচ্চারণ -

> "মেয়েদের সুক-দুঃখ, বভাথা-বেদনা, আশা-হতাশা, ব্যার্থতা-সার্থকতা অনামিকা দেবীর লেখনীতে যেমন ফোতে তেমন বুঝি আর কারো নয়। ..... আমি দেখতে পাই ভয়ংকর প্রগতির হাওয়ার মধ্যেও জায়গায় জায়গায় বন্দি হবে আছে সেই চিরকালের দুর্গতির রুদ্ধশ্বাস। দেখতে পাই, আজও লক্ষ লক্ষ মেয়ে - সেই আলোহীন বাতাসহীন অবরোধের মধ্যে বাস করছে। এদের বাইরের অবগুণ্ঠন হয়তো মোচন হয়েছে, কিন্তু ভিতরের শৃঙ্খল আজও অটুট।"

কাজেই দেখা যাচ্চে তিনি সেই অবরোধবাসিনীদের কথাই বারে বারে নানা মাত্রায় বলেছেন তঁর লেখায়। তিনি তাই বলেছেন -

> "আমার নিরুচ্চার প্রতিবাদগুলোই যেন এক একটি প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি হবে আমার কাহিনীর নায়িকারূপে দেখা দিয়েছে।"

আরএই নায়িকারা হলেন - সত্যবতী, সুবর্ণলতা, বকুল, কাবেরী, সুনয়না, টুনি। এই নায়িকারা কিভাবে প্রতিবাদ করে? কতটা প্রতিবাদ করেছে? উপন্যাসের সময় ও সমাজদর্পণে এই সমস্ত প্রশ্নের ভাববার অবকাশ আছে। দেখা যাক 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে কতখানি অনিবার্যরূপে প্রতিফলিত হয়েছে সে প্রতিবাদ, পাঠক এই উপন্যাস পাঠকালে কোন্ কোন্ প্রশ্নের সম্মুখীন হবেছেন, ত্রয়ী উপন্যাসের কাহিনীর পরম্পরায় 'সুবর্ণলতার অবস্থান কোথায় - এই নানান প্রশ্নের উত্তর জানতে উপন্যাসের সময়চেতনা ও সমাজতত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করা যাক।

সুচনা:

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্যচিন্তার প্রেক্ষিত বা সূত্র যা তাঁর স্বীকারোক্তিতে উঠে এসেছে, তা হল -

(ক) "সারাজীবন এই যে এত লিখেছি তার সবগুলির মুখই ফিরে আছে

সত্যের দিকে, জীবনের দিকে, বাস্তবের দিকে। সংগ্রামের কথা বলেছি, জটিলতার জট খুলিনি, কিন্তু দেখিয়েছি কত অসম্ভব জায়গায় থাকে তাঁর গাঁটগুলি, মনে হবয়েছে আমার লেখা মানুষকে তার ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে, তার মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে যদি কোনোরকমে কাজে লেগে যায়, তা হলেই তো লেখা সার্থক।"

(খ) "বাইরের জগতের সব কিছু ভাঙ্গাগড়া, যুদ্ধ-বিদ্রোহ, রাষ্ট্রের উত্থান-পতন এসবের হিসাব লিখে রাখেন ইতিহাসকার। কিন্তু সে ইতিহাস অন্তঃপুরের কথা বলে না এবং হিসেব রাখে না তার ভাঙ্গাগড়ার অথচ সেখানেও চলে যুদ্ধ, বিদ্রোহ, মুক্তি ও তপোস্যা। আমার এই তিনখানি উপন্যাস (ট্রিলজি) সেই যুদ্ধ আর তপস্যার ইতিহাস।"

টিপ্পনী

এই উদ্ধৃতি থেকে লেখকের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আসলে তাঁর ট্রিলজি বংশপরম্পরায় ইতিহাস। তিনটি প্রজন্মের আখ্যান। প্রবহমান মহাকালের প্রেক্ষাপটে তিনটিনারী চরিত্রের অন্তর্মোচন।

(১) সত্যবতী:

'এ বিয়ে বিয়েই নয় শুধুমাত্র পুতুল খেলা। এ আমি মানি না' (ন বছরেদর মেয়ে সুবর্ণলতার বিয়ে হওয়াতে) কিংবা, নিজের সংসার সম্পর্কে প্রশ্ন - 'বিয়েটা কেন ভাঙা যায় না?

(২) সুবর্ণলতা:

'তোমার ময়ে, মায়ে তাআনো বাপে খেদানো তেজটা ফলাবে কোন পতকাতলে দাঁড়িয়ে? থিক্কার দিতে এসো না মা শুধু এইটুকু ভেবো।'

(৩) বকুল;

'মাগো ! তোমার পুড়ে যাওয়া, হরিয়ে যাওয়া লেখা সব আমি খুঁজে বার করবো, সবকথা আমি নতুন করে লিখবো। দিনের আলোয় পৃথিবীকে জানিয়ে যাবো অন্ধকারের বোবা যন্ত্রণার ইতিহাস।

'সুবর্ণলতা' উপন্যাসের সেকাল-একাল-চিরকাল:

সময়কে সঠিকভাবে ধরে রাখে সাহিত্য। 'সুবর্ণলতা' উপন্যাস সম্পর্কে লেখক জানান-

টিপ্পনী

"আপাতদৃষ্টিতে 'সুবর্ণলতা' একটি জীবনকাহিনী, কিন্তু সেইটুকুই এই গ্রন্থের শেষ কথা নয় সুবর্ণলতা একটি বিশেষ কালের আলোখ্য। যে কাল সদ্যবিগত, যে কাল হয়তো বা আজও সমাজের এখানে সেখানে তার ছায়া ফেলে রেখেছে । 'সুবর্ণলনতা' সেই বন্ধন-জর্জরিত কালের মুক্তকামী আত্মার ব্যাকুল যন্ত্রণার প্রতীক।

আর একটি কথা লা আবশ্যক। আমার 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' গ্রন্থের সঙ্গে এর একটি যোগসূত্র আছে। সেই যোগসূত্র কাহিনীর প্রয়োজন নয়, একটি 'ভাব' কে পরবর্তি কালের ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজন।

"সমাজবিজ্ঞানিরা লিখে রাখেন সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস, আমি একটি কাহিনীর মধ্যে সেই বিবর্তনের একটি রেখাঙ্কনের সামান্য চেষ্টা করেছি মাত্র।"

কাজেই 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসের হিসেবে কালের আখ্যান, যে-কাল অপসৃয়মান এবং বর্তমান, যা আসন্ন ভবিষ্যতের সামনে প্রশ্নাতুর। ব্যাক্তি সুবর্ণলতাকে জানতে হলে প্রথমে তার মা 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সত্যবতীকে জানতে হয়। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' র সময়কাল উনিশ শতকের প্রাথমিক পট। যে শতক শিক্ষার আলোয় ব্যাক্তির আশা-আকাঙ্খা ও মননের স্বাধীনতায় প্রাচীন জড়তাবদ্ধ প্রথার বিলুপ্তি সাধনে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, সেই শতকে বঙ্গলোকে লেখকের যখন অধিকাংশব্যাক্তির ভূমিকাকে নিন্দার চোখে দেখছেন, প্রথার সপক্ষে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন যোগাচ্ছেন তখন আশাপূর্ণার সত্যবতী ব্যাক্তি হিসেবে প্রথার বিপরীত স্রোতে অবগাহন করতে চেয়েছেন । পুরুষতান্ত্রিক সমাজজব্যবস্থার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে সে শুধু প্রতিবাদ করেই থেমে থাকেনি, ধীরে ধীরে সেই প্রতিবাদের ফল স্বরূপ ঘৃণায় বিরক্তিতে স্বামী সংসারেদর শৃঙ্খলকে অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে পড়েছে মনুষ্যত্ববোধের আশ্রয়ে। ফলত সত্যবতীর স্বামী নবকুমার অভিশাপ দিয়েছে যে মর্মে - 'মেয়ে মানুষের এত সাহস ভালো ণয় ল আমি বলে দিচ্ছি, অশেষ দুঃখু আছে তোমার কপালে।' সেখানে সত্যবতীর প্রতিক্রিয়া - 'তাই দিয়ে এসেছ তোমরা আবহমানকাল থেকে। স্বামী হবে, বাপ হবে, ভাই হয়ে। ওঠা নতুন নয়। অভিশাপের জীবন আমাদের।'

সত্যবতীর শেষ স্বপ্ন সুবর্ণলতা। একমাত্র আশা - 'সংসারের তপ্ত বালুকায় এক টুকরো স্নিগ্ধ ছাড়া।' 'সুহাসের মতো হবে সুবর্ণ'। ষোলো বছর বয়স না হলে বিয়ে দেবো না সুবর্ণর'। সত্যবতীর সব স্বপ্নই ভেঙ্গে যায়। 'সুবর্ণ যদি মানুষ হওয়ার মালমশলা নিয়ে জন্ম

থাকে ..... হবে মানুষ। নিজের জোরেই হবে। তার মাকে বুঝবে।' সুবর্ণলতার নিজের জোর কতখানি ? নিজের ক্ষমতার উপর অনেকখানি আস্থা আর আশা ছিল' সুবর্ণলতা। সুবণ চরিত্রের কাঠামো বা পরিকল্পনা আশাপূর্ণা 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' তেই এঁকে নিয়েছিলেন। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' - তে সত্যবতী যে স্বপ্নে ও আকাঙ্খায় সুবর্ণকে প্রতিষ্ঠিত বা তার মানস গঠনে সক্রিয় ছিলেন সেই স্বপ্নভঙ্গের সম্প্রসারিত সৃজনভূমিতেই আশাপূর্ণার 'সুবর্ণলতা' উপন্যাস তথা কেন্দ্রীয় চরিত্রের নির্মিত। সুবর্ণলতা নিজের জোর অনেকখানি পরাস্ত হব নয় বছর বয়সে 'অকালবিবাহ' নামক প্রতিষ্ঠানের কাছে। তাছাড়া 'নয় বছর বয়স' কী 'নিজের জোর' দেখানোর পক্ষে উপযুক্ত ? অসংস্কৃত সঙ্কীর্ণ শ্বশুরবাড়ির পুরুষতান্ত্রিক প্রতাপের বিরুদ্ধে সুবর্ণলতা নিজের ক্ষমতা ও আস্থার ওপর ভরসা করে ধীরে ধীরে জেহাদ গর্জন বর্ষন করতে পেরেছে, আর পাঁচটা বাঙালি মেয়ের মতো বিয়ের পর নিজস্ব আশা-আকাঙ্খাকে স্পর্ধিত আওয়াজে তুলে ধরেছে। এর বহুপুর্বে এর বহুপূর্বে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্পকর্ণে 'কমলাকান্তের দপ্তর' -এরর কলমটি বলেছিলেন -

> "ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বা পুত্রসুখ নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যদি বিবাহবন্ধে মনুষ্য-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই।"

সুবর্ণলতা তার গৃহত্যাগিনী মা'র সামাজিক কুৎসাকে সঙ্গে নিয়ে সংসার মঞ্চে প্রবেশ করেছে। তবু তার ত্রিশ বছরের সংসার অভিজ্ঞতা - পিঞ্জরের যন্ত্রণাবোধে অহরহই ছট্‌ফট করেছে।

'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে নাম ভূমিকায় যে চরিত্রটিকে আশাপূণর্ণা তুলে ধরেছেন এবং যে যুগ বা কালের প্রেক্ষিতে তাঁকে আঁকছেন সেই যুগে বা কালে মুষ্টিমেয় মেয়েরাই বিদ্যালয়নে পড়ার সুযোগ পেত। উনিশ শতকে একদিকে পেয়নেছে মেয়েরা লেখাপড়ার অধিকার, আবার এই শতকেই মেয়েদের লেখাপড়া শেখা বা বেশি লেখাপড়া শেখার কোনো দরকার নেই - শোনা গেছে এমন সামন্ততান্ত্রিক উচ্চকিত কণ্ঠস্বর। এই মিশ্রনই দেখা গেছে সুবর্ণলতায় ল 'সুবর্ণলতা' উপন্যবাসে মেজবৌ 'পাশের পড়া' - র ইচ্ছায় মুক্তকেশীর তির্যক মন্তব্য -

> "ওর বিদ্যেবতী মা ওকে বিদ্যে শেখাতে ইস্কুলে পড়াচ্ছে। আরও পড়াবে, পাশের পড়া পড়বে মেয়ে।"

১৮৯০ - ৯১ সালের শিক্ষাবিবরণী থেকে উনিশ শতকের স্ত্রী-শিক্ষার অগ্রগতির সংবাদ যেমন জানা যায় তেমনই 'কৃষ্ণভাবিনী দাসের নির্বাচিত প্রবন্ধ' থেকে জানা যায় -

টিপ্পনী

'গ্রামে তখন স্ত্রী শিক্ষার ব্যবস্থা ও রীতি ছিল না।' আবার উনিশ শতকের সংবাদপত্রের পাতায় মেয়েদের চিন্তনবিশ্বের খবরাখবর পরিবেশিত হচ্ছে। কৃষ্ণকামিনী দাসী, ফয়জান্নেজা চৌধুরানী, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ লেখকরা বাংলার মেয়েদের দুঃখ কষ্টের কথা, স্ত্রী - শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, ব্যাক্তি-স্বাধীনতের কথা তুলে ধরেছেন তাঁদের লেখায়। আশাপূর্ণা দেবী সেই ধারারই যোগ্য উত্তরসূরি।

টিপ্পনী

'সুবর্ণলতা' : স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের উপন্যাস

স্বপ্ন মানুষের ইচ্ছার প্রকাশ। এক কথায় স্বপ্ন হচ্ছে 'Fulfillment of Desire'। তা মানুষের ভাবনার ফসল। বাস্তবের মরে যাওয়া বাসনাগুলো যখন ব্যাক্তির নিদ্রিত পটভূমিতে এসে হাজির হয়ে স্বিকৃতির আকাঙ্খায় বা প্রতিষ্ঠিত করার এষণায় মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে তখন তা স্বপ্নের আকারে ধরা পড়ে। স্বপ্নের রূপটি রবীন্দ্রকাব্যে ধরা পড়ে এভাবে - 'স্বপন আমার ভরেছিল কোনো গন্ধে / ঘরের আধার কেঁপেছিল কী আনন্দে'। স্বপ্নত্ত্বের এই নিরিখে 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে সুবর্ণলতা নাম্নীনারীর স্বপ্ন জগৎটাকে বুঝে নেওয়া যেতে পারে। সুবর্ণলতার স্বপ্নবিশ্বাসটা কেমন ? সুবর্ণলতা ভব্যতা চেয়েছে, সভ্যতা চেয়েছে মানুষের মতো হয়ে বাঁচতে চেয়েছে। সুবর্ণলতা বাইরের পৃথিবীর বই পড়েছে, পড়িয়েছে, ছেলেদের সঙ্গে আবৃত্তি করেছে। প্রতিদানে সে পেয়েছে কি ? পেয়েছে স্বামীর আঘাত, শাশুড়ির কটু-তির্যক মন্তব্য, এমনকি নিজের ছেলে-মেয়ের কাছেও অসহযোগিতা। ফলস্বরূপ সুবর্ণলতার মনের মধ্যে তৈরি হয় 'Loss of individuality'। সংসারেরমথ্যে থেকেও মানবিক সম্পর্কের অভাবে মনের মধ্যে গড়ে ওঠে - 'A sense of annoymity ..... The man (Woman) feels that he (She) is unimportant (মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ, বিনয় ঘোষ)

এরকম নিঃসঙ্গ, পরাজিত এক মেয়ের কাহিনী শোনাতে কিংবা বলা যায় সুবর্ণলতা চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীর ভাগ্য বিপর্যয়ের আবহমানকালের ইতিহাসকে ধরতে চেয়েছেন আশাপূর্ণা, যা তাঁর স্বীকারোক্তিতে ধরা পড়ে -

> "সুবর্ণলতা সেই সুর্লভ মেয়েদের একজন - যারা তাদের কালকে অতিক্রম করে যায় - এগিয়ে দেয় প্রবহমাণ কালের ধারাকে, যে ধারা মাঝে মাঝে স্তিমিত হয়ে যায়, নিস্তরঙ্গ হয়ে যায়। এরা বর্তমান কালের পূজা পায় কদাচিৎ, এরা লাঞ্ছিত হয়, উপহাসিত হয়, সমসাময়িক সমাজের বিরক্তিভাজন হয়। এদের জন্য কাঁটার মুকুট, এদের জন্য

জুতোর মালা। ..... তবি এরাই একদিন স্মরণীয় হয়ে ওঠে - এদের দিয়েই সাহিত্য সৃষ্টিহয়। ..... সুবর্ণলতা এইরকম একটি নারী চরিত্র।"

'সুবর্ণলতা' উপন্যাসের সুবর্ণলতা, প্রবোধ ও মুক্তকেশী চরিত্র :

টিপ্পনী

আশাপূর্ণা জানিয়েছেন 'সমাজ বিজ্ঞানীরা লিখে রাখেন সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস, আমি একটি কাহিনীর মধ্যে সেই বিবর্তনের একটি রেখাঙ্কণের সামান্য চেষ্টা করেছি মাত্র।' বলা বাউল্য নিতান্ ত পারিবারিক গল্পেও সময়, সমাজ, ইতিহাস ধরা থাকে। সমাজসচেতন লেখক সেই বিশেষকে সামান্যের সঙ্গে, ব্যাক্তিকে বিশ্বের সঙ্গে এবং সীমাকে অসীমের সঙ্গে মিলিয়ে দেষন তাঁর শিল্পগুণের যাদুতে । আশাপূর্ণা তাঁর 'সত্যব্রতী ট্রিলজি'তে তা সার্থকভাবে করতে সমর্থন হয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি যে সচেতন ছিলেন তারও প্রমাণ আছে তাঁর কথায় - 'সুবর্ণলতা একতি বীশেষ কালের আলেখ্য। যে কাল সদ্যবিগত, যে কাল হয়তো বা আজও সমাজেরএখানে সেখানে তার ছায়া ফেলে রেখেছে। 'সুবর্ণলতা' সেই বন্ধন - জর্জরিত কালের মুক্তিকামী আত্মার ব্যাকুল যন্ত্রণার প্রতীক ।' সুতরাং সুবর্ণলতা চরিত্রের দায়িত্ব অনেক বেড়েছে। তারই মধ্যে দ্যোতেত হয়েছে নারী - মুক্তির আকাঙ্খা ও ব্যাকুলতা। তার জন্য মন ও লড়াই, প্রতিবাদ প্রতিরোধের শক্তি থাকা প্রয়োজন - সুবর্ণলতা তা অর্জন করেছে। সে শক্তি তার ছিল বলেই চলার পথের ছোটো ছোটো বাধা যে অতিক্রম করে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়েছে।

সময় ও সমাজকে একটি ব্যাক্তি তার লড়াই দিয়ে কতটা বদলাতে পারে সে প্রশ্ন থেকেই যায়। কিন্তু মানবত্মার মুক্তির পথের বাধাগুলো সে চিহ্নিত ককরতে পারে। তার সীমাবদ্ধতাকে উল্লেখ করতে পারে। তার বিকল্প উজ্জ্বল দিকের অনুসন্ধান ও প্রতিস্ধাপন করতে পারে ল প্রশ্ন তুলতে পারে, উত্তর দিতে পারে। প্রতিকূলতার বাধা অতিক্রম করে পথ কেটে কেটে অগ্রসর হতে পারে। লড়াইটা ব্যাক্তির হলেও সমাজ পরিবর্তনের স্রোত বা নীরব আন্দোলন অবশ্যই চলমান থাকে। ব্যাক্তি তাকে কোনো না কোনো ভাবে প্রত্যক্ষ করে এবং উপলব্ধি করে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে একটু একটি করে বদলে যাচ্ছিল । সঙ্গে ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের নানারূপ । সেই পারিবারিক জীবনের খাঁচাভাঙার আকুল আর্তনাদই সবর্ণলতা চরিত্রে ধ্বনিত হয়েছে । অবশ্য তার বিকল্প রূপ সমাজই তার সম্মুখে মেলে ধরেছিল । সুবর্ণলতা তাকে গ্রহন করতে চেয়েছে । পুরনো জীবনযাত্রার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। প্রশ্ন তুলেছে এবং শুধু তাই নয় তাকে বদলেছে

নিজের মতো করে।

পরিবর্তনটা ভিতর বাইর দুদিকেরই বিষয়। সমাজ, পরিবার এবং ব্যাক্তি তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নতুন পথ খননের প্রয়াস পায়। স্বাধীনতাকামী সুবর্ণলতা সেই পরিবার খাঁচা ভেঙে, প্রথা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এগিয়ে গেছে। সবসময় 'জয়' তার ভাগ্যে জোতেনি। সেটা সম্ভবও নয়। কিন্তু সমাজ নয়, বরং সমাজ পরিবর্তনের চেতনায় সে পরিবারের বাঁধন ছিন্ন করার প্রয়াস পেয়েছে। বড় মাপের বিপ্লবী তত্ত্বকথায় তাই ভরপুর নয় তার জীবনকথা, সমাজ পরিবর্তনের ব্যাপক আন্দোলনের কোনো চিহ্নও নেই তার। কিন্তু 'বড় পরিবর্তনের' পাশে অন্তপুরচারিণীর অন্দরমহলের ক্ষুদ্র তুচ্ছ পরিবর্তন কীভাবে ঘটে আশাপূর্ণা সুবর্ণলতার মধ্যে তারই প্রস্তুতি দেখিয়েছেন। এমন করে বাংলা সাহিত্যে আর কেউই তা পারেননি। বহুধাব্যাপ্ত বিচিত্র জীবনের এই পারিবারিক আন্দোলনের চিহ্ন আর কে এমন করে এঁকেছেন? সত্যবতীতে যার সুচনা সুবর্ণলতায় তাই প্রবাহিত। আর হেরে যাওয়া সুবর্ণর আরব্ধ ভাবনা বিবর্তিত তার কন্যা বকুলে।এর মধ্যে সুবর্ণলতার যন্ত্রণা ও লড়াই সমধিক। পরিবার সমাজ এবং জীবনে প্রাচীনের নবীনের সংঘাত সুবর্ণলতাতেই প্রকাশিত। তাই সে এত বেশি জীবন্ত। মায়ের পরাজয় যেন তাকে আরো বেশি উজ্জ্বল করেছে।মায়ের আরব্ধ ভাবনা ও কাজের দায়িত্ব নিয়ে সে যেন এই কাহিনিতে আবির্ভূত।

যুদ্ধের জন্য জীবন নয়। জীবনের জন্যই যুদ্ধ। এবং সেই কাঙ্খিত জীবন যতক্ষণ না তার করায়ত্ত হচ্ছে সে তার লড়াই জারি রাখে। এই লড়াই মানুষকে কর্কশ, কঠিন করে। নারীর ক্ষেত্রে তা আরো বেশি। কিন্তু এছাড়া সচেতন সেই মানুষটির কিছু করার থাকে না। নারীসুলভ কমনীয়নতা, মমতামাখা স্নিগ্ধ কোমল জীবন-আচরণ, ভাষা তাই অনুক্তই থেকে যায় সুবর্ণলতায়। কেবল অন্ধকারেদর মেঘ চিরে ঝলসিত বিদ্যুতের মতো কখনও অবকাশে তা বেরিয়ে পড়েছে। এবং তার চিরগুপ্ত সেই সত্তার প্রকাশ তাকে অন্য নারীতে পরিণত করেছে। বলা যেতে পারে এই অবকাশে নারী স্বাধীনতার নামে উৎকট কোনো স্বেচ্ছাচারিতার কথা বলেননি আশাপূর্ণা। তিনি মানব মুক্তির কথা বলেছেন। নারী তাই অন্য কিছু নয় 'মানবী' হওয়ার চেষ্টাতেই বিদ্রোহ করেছে। মুক্তি চেয়েছে কেবল অহেতুক বন্ধন থেকে। অপ্রোজনীয় বিশ্বাস সংস্কার থেকে। ক্ষুদ্র তুচ্ছ জীবন থেকে। আকাশ বাতাস সমুদ্রের বৃহত্ত্বের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চেয়েছে সে। যাবতীয় কদর্যতা ও কুৎসিত অভ্যস্ত অভ্যস্ত জীবন থেকে মুক্ত হয়ে সুন্দরের পূজারী হতে চেয়েছে। আরাধনা করেছে বৃহতের, অসীমের, স্বাধীনতার, আনন্দের। ছোটো ছোটো পারিবারিক ঘটনার মাধ্যমে আশাপূর্ণা সুবর্ণলতার মধ্য দিয়ে তাই অপরূপভাবে ব্যাক্ত করেছেন।

টিপ্পনী

সুবর্ণলতার শৈশব অচিরেই বিনষ্ট হয়েছে । মাত্র ‘বছর বয়সে তার মায়ের অণুপস্থিতে তার পিতামহী তার সইয়ের মেয়ের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন তার। মা এখবর শুনে গ্রামের বাড়িতে এসে একদন্ড অপেক্ষা না করে স্বামীর উপর অভিমানে সংসার তভাগ করে কাশীবাসী হয়েছেন। তিনি যে মেয়েকে পড়াশুনা শিখিয়ে অনেক বড় করতে চেয়েছিলেন। এ ষড়যন্ত্রে তাঁর সমস্ত সাধ ও স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়েছে। এরপর নবকুমারও কেমন হয়ে গেছেন । সুবর্ণলতা শুধু তার শৈশবই হারায়নি । হারিয়েছে তার মা বাবা এবং পিত্রালয়কেও। আর পেয়েছে এক নিষ্ঠুর সংস্কাচ্ছন্ন শ্বশুরবাড়ি; স্বামী এবং শাশুড়ি। মায়ের গৃহত্যাগের নিন্দাবাদ নিয়ে কথা, শুনে তার সারাজীবন কেটেছে। শাশুড়ির মুখে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তার মা ও ঠাকুমার নিন্দা শুনতে হয়েছে। স্বামীও কথা শুনিয়েছে। স্বামী স্থূল, সন্দেহবাতিকগ্রস্থ, অধিকমাত্রায় বউ অনুরাগী। যথেষ্ট উপার্জন করে সে। তবু স্বামীকে যোগ্য ও যথার্থ পুরুষ ও মানুষ বলে মনে করতে পারেনি সুবর্ণলতা।এই সংসারে মানসিক অত্যাচার নিয়ত জুটেছে তার। প্রথম প্রথম মুখ বুজে সহ্য করলেও একসময় মুখর হয়েছে সুবর্ণলতা। কথা বলতে শিখেছে। প্রতিবাদ করতে শিখেছে। ভাসুর, দেওর, শ্বাশুড়ি, ননদ সবাই তাকে সমঝে চলেছে। তার স্পষ্টবাদিতা, প্রচলিত নিয়মকে ভাঙা, যুগের অগ্রগতিতে পা মেলানো - সংসারের সঙ্গে নিত্য সংঘর্ষ বাধিয়েছে। আর তাই -ই তাকে বিশেষত্ব দিয়েছে। যদিও এ লড়াই তার একক লড়াই। নিঃসঙ্গ সুবর্ণলতা লতার মতো কোমল ও পরাশ্রয়ী হতে না পেরে কঠিন এবং নিঃসঙ্গ এক নারীর নাম হয়ে উঠেছে।

নতুন বাড়ি দেখতে যাওয়ার বাসনা, প্রয়োজন ও প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে থাকা এক জগৎকে আবিষ্কার করার অবকাশের এক বারান্দায় সাধ ও স্বপ্ন, স্বামীর মিথ্যা প্রবোধ প্রবঞ্চনা, সেই বারন্দাহীন বাড়িতে সবচেয়ে ওঁচা ঘর বেছে নিয়ে সুবর্ণলতার জীবনযাত্রা শুরু হয়েছে। একটা প্রতিজ্ঞাও সে অশ্রুজলে করেছে - ছেলেরা বড় হয়ে রোজগার করলে সে বারন্দাওয়ালা বাড়ি করবে। স্বামীর বারান্দা নিয়ে মিথ্যা স্তোকবাক্য তার প্রতি অসীম ঘৃণা জাগিয়ে তুলেছে। কান্নায় ভেঙে পড়েছে সে, অভিমানে আহত হয়েছে ‘তুমি আমায় ঠকালে কেন ? কেন ঠকালে আমায় ? প্রবোধ সুবর্ণর চুলের মুঠি ধরে, গলা ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিতে চায় - আবার শারীরিক সুখের প্রত্যাশায় সন্ধি করে। রাত্রে নাক ডেকে ঘুমায়। আর সুবর্ণর দীর্ঘশ্বাসে বাড়ি ভারি হয়ে ধাকে। এই সব খাওয়া, ঘুমনো, বংশবৃদ্ধি করা, তাশ পাসা খেলা, মেয়েদের শাসন করা - জীবদের নিয়ে সুবর্ণকে সারা জীবন থাকতে হবে - একথা ভেবে চৌদ্দ বছরের সুবর্ণলতার নিদ্রাহন রাত কাটে। অভিমান হয় ঠাকুমার প্রতি। তিনি এ কান্ড না ঘটালে - আজ পাশের পড়া পড়তো সুবর্ণ। মা তাকে কখনও বিয়ে দিতনা ল

টিপ্পনী

কিন্তু মা কি তার যথার্থ কর্তব্য পালন করেছে ? নিজে হয়তো পালিয়ে বেঁচেছে সে। কিন্তু সুবর্ণর কথা কি একবারও তার মনে হয়নি ! তাঁর জন্য তো তাকে নিয়ত নিন্দা সইতে হচ্ছে। কিন্তু এ ভাবনার অংশীদার কে হবে ? কাকে বলবে সুবর্ণলতা এসব কথা ? না কাউকে না। কারণ সুবর্ণলতারা একলা চিরকাল। তাই -

"যেদিন বড় দুঃখ হয়, অপমান হয়, রাতদুপুরে এইসব চিন্তায় ছট্‌ফট্‌ করে মরে সুবর্ণ, আর সমস্ত ছাপিয়ে মায়ের উপর একটা দুরন্ত অভিআনে দীর্ণ হতে থাকে।"

টিপ্পনী

কারণ মা-ই তো তার চেতনায় সদাজাগ্রত। সে তো মায়ের প্রবাহ - সেই মায়েরই। তাই চক্রান্ত করে মুক্তকেশী যখন প্রবোধকে নিজের কাছে শোওয়ার বন্দোবস্ত করেন সুবর্ণ যেন মুক্তি পায়। ননদকেও সঙ্গে নিয়ে শোওয়ার প্রস্তাব বাতিল করে বলে - একলা বেশ শোব । বরং সুখে ঘুমোবো, সারারাত একজনকে বাতাস করে মরতে হবে না।

আবার বর যখন আপিস পালিয়ে দিনে দুপুরে চিলেকোঠায় সুবর্ণর জন্য অপেক্ষা করে তখন বিরাজকে পাঠিয়ে সে মজা দেখে। তার কৌতুক-সৃজনের, পরিণামের ভাবনাকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে এক কৈশোরিক সাহসের পরিচয় মেলে। যদিও অনিবার্যভাবেই এর জন্য তাকে খেসারৎ দিতে হয়, জোটে শারিরীক শাস্তিও। ছেদ পড়ে কৌতুক স্পৃহার।

সুবর্ণলতার ছাদের আকাঙ্খার মধ্যে স্বামী খুঁজে পায় পাঁচবাড়ির জানালায় উঁকিঝুঁকি মারা, নিজেকে তাদের সামনে তুলে ধরার, এমনকী চিঠি চালাচালির বদ উদ্দেশ্যও। সে কী করে জানবে ছাদে উঠে নিজেকে দৈনন্দিন দাসত্বের বন্ধন ছিন্ন করে একটু মুক্ত হয়ে আকাশে মনকে উড়িয়ে দেওয়ার অতি স্বাভাবিক প্রবণতাকে সিঁড়ি তো শুধু সিঁড়ি নয়, ছাদ তো শুধু ছাদ নয়। সে যে ক্ষণেকের মুক্তির উপায়। কিন্তু শুধু কি ছাদ চেয়েছে সুবর্ণলতা ? না। না পেলেও চেয়েছে সে আরো অনেক কিছু। সভ্যতা, ভব্যতা মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকা, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে নাড়ীর যোগ। আর দুঃসহ স্পর্ধার মতো দেশের কথা ভাবতে চেয়েছে, দেশের পরাধীনতার অবসান চেয়েছে। তার পরিবেশ তাকে যে পীড়া দেয়, তার সমস্ত সত্তা মুক্তি আকাঙ্খায় ছট্‌ফট্‌ করে। এ সংসারে সুর্বণলতা ব্যাতিক্রম, সুবর্নলতা স্পষ্টবাদী, বিদ্রোহী। বাকি জা - দেওর মতো নীরবে সব ব্যবস্থা মেনে নেয়না সে। সংসারের সব বউ যখন খায়, দায়, ঘুমোয়, ছেলে ঠেঙায় তখন অতৃপ্ত অশান্ত অসন্তুষ্ট সুবর্ণলতা কেবলই ছন্দপপতন ঘটায় - কথায় কাজে। আঁতুড় ঘরে যন্ত্রণার মধ্যে ময়লা কাপড়ের জন্য প্রতিবাদ জানায়, তর্ক করে, শাশুড়ির অমানবিকতার কথা বলে। নিজের মরণ কামনা করে। শাশুড়ি বাপের বাড়িরখোঁটা দিলে স্পষ্ট জানায় বাবা যখন নিতে চেয়েছিল তখন তো এরাই

পাঠায়নি। মেয়ের জন্ম দিলে শাশুড়ির তীব্র তিরস্কারে মনে পড়ে মাকে। মায়ের উক্তি - 'ছেলে মেয়ে দুই ই সমান সুবর্ণ, হেলা করিস না।' চেতন অচেতনের সেই মুহূর্তে মা যেন মাথার কাছে আসে। সুবর্ণ হাত বাড়িয়ে মাকে ধরতে যায়। পারেনা। এমন দিনে মার মতো এমন আপন এমন অবলম্বণ আর কে ! তার অতীতকে বারবার ভুলতে চেয়েও, মায়ের প্রতি অভিমানী হয়েও সেই মাকেই পেতে চায় সুবর্ণ।

সে সৎ, প্রতিবাদী বলেই সে উদার। তার মন আকাশের মতো বড় ।কোনো সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থ, অকর্তব্য, কার্পণ্য - সেখানে স্থান পায়নি। তাই ননদ বিরাজের বিবাহে গয়না এবং টাকার সমস্যার সমাধান এক লহমায় করে সে। সমস্ত গয়না সেই দেবে জানিয়ে দেয়। তখনও কি সুবর্ণ জানতো না স্বামীর কাছে এর ধিক্কৃত হতে হবে। তা জানতো সুবর্ণ। তাতে তার কিছু যায় আসে না। প্রবোধের সঙ্গে পরামর্শের প্রয়োজনও মনে করেনা সে। আর বিয়ের দিন গয়না চুরি গেলে, সেই গয়না লুকিয়েছে মহত্ব এবং স্বার্থ দুই কুল বজায় রাখতে - এমন অভিযোগ শুনে চোরকে নির্দিষ্ট করা, মায়ের সামনে ছেলেকে ডাকা, দিব্যি গালানো, এনিয়ে স্বামীর তাকে ঠ্যাঙানোর সব ইতিবৃত্ত সবার সম্মুখে ব্যক্ত করতে ভয় বা দ্বিধা কোনোটাই হয়নি সুবর্ণর। তার সততা ঔদার্য প্রতিবাদ, স্বামীর মান অপমান বা শাশুড়ির উখের ওপর জবাব কারুরই কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করেনা। ননদের গায়ে হলুদের দিন আঁচল পাকিয়ে আত্মহত্যার প্রয়াসও তার সেই প্রতিবাদী সত্তার অন্যতম প্রকাশ। আর বিরাজ যখন তাকে স্বীকৃতি দেয় - 'এতদিন তোমায় চিনতে পারিনি মেজবৌ, কত লাঞ্ছনার কারণ হেছি ! তুমি দেবী।' তখনও সুবর্ণলতা নিস্পৃহ থাকে। কেননা যশের লোভে কোনো কাজই করেনা সে।

সুবর্ণর সমগ্র জীবন এমন খন্ড প্রলয়। এমন লোকের চোখে স্ববিরোধী, যুক্তিহীন, এমন উগ্র, অস্বাভাবিক। দর্জিপাড়ার ঐ বড় বাড়িতেও তাই কুলায়না তাকে, মানায়না। সব কথায় সব ককাজে সবাইকে সে ছাড়িয়ে যায়। সে যে চেতনার দিক থেকে অনেক দূরের মানুষ, অনেক অগ্রবর্তী। সংসারের, স্বার্থের সংক্ষীর্ণ সীমানাকে বার বার ছাড়িয়ে যায় সে। বরকে অস্বীককার করে সে, মুখের উপর জবাব দেয় শাশুড়ী ও বরের, বর তবু তাকে এক পলকের জন্য আরাতে চায় না। তাই সবাই ঈর্ষা করে তাকে। বোঝেইবা কতজন ? গয়না কেলেঙ্কারির দায় সুবর্ণর ঘাড়েই তো চাপাল সবাই। এমনটাই হয় বোধ করি।

তারপর রীতি ভাঙা শুরু। শুরু প্রথা ভাঙা, নিষেধাজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করা। কেননা বড় ঠাকুরজামাই কেদারনাথ তাকে বুঝেছিলেন। বাবার বয়সী এই লোকটার সারল্য, সরসতা সুবর্ণলতাকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর সঙ্গে কথা বলার অনুমতি আদায় করতেও অনেকগুলো প্রশ্নের বেড়াজাল পেরতে হয়েছিল। মুক্তকেশী বলেছিলেন তাতে যদি সুবর্ণর চারখানি

টিপ্পনী

হাতপা বেরয় তাহলে তাই হোক। সুবর্ণলতা নীয়ম ভাঙার মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে। না, তাতে বন্ধনহীনতা নেই, ভোগস্পৃহা নেই, উচ্ছৃঙ্খলতা নেই, যৌনস্বাধীনতার বিকার নেই। কদর্য নিয়ম ভেঙে সে সভ্য ভব্য সৌন্দর্য এবং সুরুচির পত্তন করেছে। -

"মেজবৌ বাড়িতে খবরের কাগজ আসার পত্তন করেছে, মেজবৌ বাড়িতে গায়ে সেমিজ দেওয়ার পত্তন করেছে, মেজবৌ আঁতুড়ঘরে ফর্সা বিছানা কাপড়ের প্রথা প্রবর্তন করেছে। মেজবৌ মেয়েগুলোকে সুদ্ধু ধরে ধরে 'পড়তে বসা'র শাসন নীতি প্রয়োগ করেছে।"

টিপ্পনী

প্রতিদানে জুটেছে ধিক্কার, লাঞ্ছনা, অপমান। নব-ভাবনায় প্রবর্তকদের এটাই তো স্বাভাবিক। উপরন্তু সুবর্ণলতা যথার্থ কথা ব্যাক্ত করতে গিয়ে তথা কথিত গুরুজনদের মানসম্মান রক্ষা করে না। গাল খেয়ে চুপ করে থাকে না সে। করে না খোশামোদ ও তোয়াজ।

তারপর বন্দী সুবর্ণর একটি সাধ জেগেছে মনে। শাশুড়ি যখন শ্রীক্ষেত্রে যাচ্ছেন সেও যেতে চেয়েছে। না, ধর্ম কর্ম করতে নয়। সমুদ্র একটিবার দেখতে। সমুদ্র কি আকাশের মতো দেখতে ? নাকি ঢেউ, তরঙ্গ, গর্জণ নিয়ে সে আরো অপরূপ আরো মহিমময়। কেদারের কাছে সেই আকুতি, সেই সাধ, সেই বিস্ময় উথলে উঠেছে। খুব বিরাট ? খুব সুন্দর ? খুব ঢেউ ? এমনকি আবেগের বশে এই মুক্তমনা মানুষটির প্রতি তার শ্রদ্ধা আবেগ এই সূত্রে বভাক্ত হয়েছে। তাঁর সাথে বিয়ে হলে খুব ভাল হল। তারপর কেদারের কাছেই শাশুড়ির সাথে যাবার অনুমতি আদায়ের কথা বলে সে। এ যেন শুধু সমুদ্র দেখা নয়। খাঁচার বন্ধন ভেঙে মুক্ত হওয়া, সীমানার চৌহদ্দি পেরিয়ে অসীম বিশ্ব ও প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করা। সুবর্ণকে লেখিকা এখানে সম্পূর্ণ আধুনিকতার দোরগড়ায় পৌঁছে দেন যেন। ধর্মের চেয়ে প্রকৃতির টান তার কাছে বড় হবে ওঠে। সব বউ সমুদ্র দেখতে চায়না। ওদের আহ্লাদ গাদা গাদা রান্না করায়, গাদা গাদা কাওয়ায়। কেদারের আশ্বাসে স্বপ্ন তার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু পরিবর্তে জোটে নিন্দা, অপবাদ, তিরস্কার, বসে যায় বিচার সভা। সুবর্ণকেও বলতে হয় - সে শুধু কথার কথা মাত্র ছিল। তবু প্রবধের দেওয়ালে মাথা ঠুকে দেওয়া আর বুড়োর সঙ্গে কথা না বলার প্রতিজ্ঞা করানোর ঘটনা ঘটেছিল। সমুদ্র দেখার সাধ মিটে গিয়েছিল সুবর্ণলতার।

আশ্চর্য জীবন। যে মুক্তকেশী বৌদের দাপট দেখান, ছেলেদের বউকে জব্দ করার কথা বলেন - তিনি কন্যার স্বাধীনতায় সুখে, বশংবদদ জামাইয়ের আনুগত্যের সংবাদে সুখী হন। অতবড় হোমরা চোমরা চাকুরে কিন্তু সুরির কাছে যেন চোরটি। সুবর্ণলতা সেই আনন্দে

বেলুনে সূচ ফোটায় ল পুরুষ মানুষ স্ত্রীর কধায় উঠছে বসছে, কোচ; কেদারা; তেবিল; আর্শি ..... এসব এই জীবন কি মুক্তকেশীর কন্যার বেলায় আনন্দ এনে দেয় আর নিজের বৌদের বেলায় ? মুক্তকেশী এ আগাত সয়ে নেন। কেননা সুবর্ণ আগুনের খাপরা। সারাক্ষণ জ্বালায় তাঁকে। কিন্তু সুবর্ণ নিজেও কি জ্বলে না ? এ দাহ সচেতন মানুষের - স্বপ্ন দেখা, প্রতিবাদী, মানুষের চিরকালের সঙ্গী - সুবর্ণ তাকে এড়াবে কীভাবে ?

মেয়ে জামাইয়ের আগমন ও তাদের জন্য হাওয়া খরচ সামলে নিতে বউদের বাপের বাড়ি পাঠাবার প্রস্তাব দেন মুক্তকেশী। সবাই একে সুযোগ ভাবলেও সুবর্ণলতা স্পষ্ট জানায় সে যাবে না। স্বামীর সঙ্গে তর্ক করতেও তার পিছপা হওয়া নেই। সে জানিয়ে দেয় পিসি একবার ছিঠি লিখেছিল - বাবার শক্ত অসুখ - সে চিঠি এরা ছিঁড়ে ফেলেছিল। ছোড়দা দাদার মেয়ের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করতে এলে তার সঙ্গেও দেখও করতে দেওয়া হয়নি তাকে - সুতরাং এই অপমানের বোঝা নিয়ে সে যাবে না বাপের বাড়িতে। মুক্তকেশী মোক্ষম অস্ত্র ব্যবহার করেন - সংসার ত্যাগের বাসনা। কেননা সুবর্ণলতা তাঁকে অপমান করেছে। সকলের সামনে সুবর্ণ আবার শাশুড়ীর কথার প্রতিবাদ করে। কিন্তু মুক্তকেশীর সংসারে তাঁর কথাই যে শেষ কথা। বউকে উচিত শিক্ষা দিতে সন্তানদের বাদ দিয়ে - ঘোড়ার গাড়ি ডেকে সুবর্ণকে বাপের বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা হয়।

কিন্তু বাপের বাড়িতেকী পেল সুবর্ণ ? সে শুধু বাবার কাছে বলেছিল - 'আর কিছু চাইনা বাবা,শুধু এইখানে থাকতে চাই।' কিন্তু সুবর্ণ তো এই সংসারকে সমাজকে চেনেনি তখনও। চেনেনি বাপ ভাইকে। তাই বাল্যের লীলাভূমি তাকে বিহ্বল করলেও, ছোড়দার মায়ের কাছাকাছি থাকার সংবাদ তাকে ঈর্ষান্বিত করলেও, ছাদের মুক্ত হাওয়ায় - ভাইঝির সঙ্গে আলাপ জমলেও, নবকুমার ও সাধনের তীব্র কঠিন আঘাত তাকে সেখান ধেকেও বিতাড়িত করল। পিতাপুত্রের গুপ্ত পরামর্শ চলে। নবকুমার ছেলেকে জানান - 'বুঝতেই তো পারলাম ঘটিয়ে এসেছেন একটা কিছু। ঝাড়ের বাঁশের গুণ যাবে কোথায় ? হয়ে উঠেছেন একখানি অনুমান করছি !' সুবর্ন এ বাড়িতে দুর্লভ ছিল, সুবর্ণ যেন একটু বিষণ্নতার আধারে ভরা একখন্ড পরম মূল্যবান রত্ন ছিল। কিন্তু সহসা সুবর্ণর দাম কমে গেল।' বাবা ও দাদা দুজনেই জানালেন কাজটা ঠিক হনি। সুবর্ণ কাতর স্বরে একবার তবু বলে, 'তুমিও তাহলে আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ বাবা' ? সাধন মনে করিয়ে দেয় শশ্বুরবাড়ি মায়েদের আসল আশ্রয়। সুবর্ণও জানায় - 'আসল আশ্রয়ের দাম তো ধরা পড়ে গেল দাদা ! এক নিমেষের এদিক-ওদিক, বলে দিল বিদেয় হও। তবু সেই আশ্রয়কেই আসল আশ্রয় বলে আঁকড়ে থাকতে হবে ?' কিন্তু সুবর্ণ কি জানত সুবর্ণদের জন্য কোনো আলয় নেই, ভবন নেই। দাসত্বের বন্ধন,

টিপ্পনী

করুণার ভগ্ন কণাই তাদের জন্য। অপমানিত সুবর্ণ শ্বশুরবাড়ি ফিরতে চেয়েছে। সাধন মেয়েকে মেরে বোনকে শিক্ষা দিতে চেয়েছে। আর অসহায় সুবর্ণ দেওয়ালে কপাল ঠুকতে ঠুকতে বলেছে - 'কেন তোমরা সবাই মিলে আমাকে অপমান করবে? -

> "..... সমস্ত অবরুদ্ধ নারী সমাজের নিরুদ্ধপ্রশ্নকে, মুক্তি দেবার দুর্দমনীয় বাসনা এটা, যা সত্যকার কোনো পথ না পেয়ে এমনউন্মত্ত চেষ্টায় মাথা কুটে মরে।"

টিপ্পনী

সুবর্ণ জলটুকু গ্রহণ না করে পিতৃগৃহ ছাড়ে। কিন্তু শ্বশুরবাড়ি 'আসল আশ্রয়' ? মাতৃভক্ত প্রবোধ দরজা আটকে দাঁড়িয়ে বলে - 'না, এমনি ঢুকে পড়া চলবে না, আমার সাফ কথা, আমার মায়ের পায়ে ধরে মাপ চাইতে হবে।' উত্তর দিয়েছিল সূবর্ণলতা। শাশুড়ীর আফিমের কৌটো দুরি করে আফিম গিলে। কিন্তু মুক্তি পায়নি। একবার নয় বারবার কখনও ঝাঁপ দিয়েচে ছাদ থেকে, ককনও গঙ্গায় তলিয়ে যেতে চেয়েছে। এ সংসারে এটাও হয়তো অণ্যতম প্রতিবাদ। সত্যবতীর কাশি চলে যাওয়া আর সুবর্ণলতার আত্মহত্যার প্রয়াস। আপাত পলায়নবাদিতার আড়ালে এই সমাজকে দেওয়া ধাক্কার প্রচ্ন ইঙ্গিত বৈকি। না হলে কাশীতে গিয়ে সত্যবতী কেন মেয়েদের স্কুল খোলেন। আর সুবর্ণলতা সমূহ বিপদ অশ্রদ্ধার ঝুঁকি নিয়ে দুলোর হাত দিয়ে পড়ে চলে, মল্লিক বাবুর দেওয়া শক্ত শক্ত বই। মল্লিকবাবাউর তাকে দেখার বাসনার প্রতিবাসনা তারও উদ্রিক্ত হয়। বই ভর্তি আলমারি সাজানো সেই ঘর আর ঘরের মালিক - যে নাকি বোঝে লক্ষ্মীর সার্থকতা সরস্বতীকে আহরণ করায়, আর দেএর দুঃখ যাকে ভাবায়, যে এই দুঃখ নিয়ে আলোচনা করে, বক্তৃতা দেয়, সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন পাল, রবিঠাকুরকে যিনি দেখেছেন - এমন মানুষকে দেখার বাসনা সুবর্ণর সেই সমুদ্র দেখার মতো আসলে বহির্জগৎ ও বৃহৎ জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার বাসনামাত্র।

সমুদ্র দেখার বাসনা মেটেনি তার। কিন্তু দুলোর অতি উৎসাহে চক্রান্তে নির্বুদ্ধিতায় এই লোককে দেখেছিল সে। আর কালবৈশাখির ভয়ঙ্কর ঝড় উড়ে গিয়েছিল তার উপর দিয়ে। 'তেজী পাজী হারামজাদী' মেজবৌ এবার হয়ে ওঠে নষ্ট ও জাঁহাবাজ। আর মুক্তকেশী জানান - 'মানুষের রক্ত যদি তোর গায়ে থাকে তো ও বৌকে লাথি মেরে মেরে ফেলে পেবো'।

স্বদেশী ভাবনায় যখন উন্মাদ গোটা দেশ তখনও তার হাওয়া ঢোকে না মুক্তকশীর সংসারে। এমনকী কাজের মেয়েহরিদাসী পর্যন্ত বলে যায় - আ বাড়ির বাবুদেদর চোখে কানে ঠুলি আঁটা। আর নিন্দাবাদ সুবর্ণর ভেতরের আগুণকে আবার উস্কে দেয়। সেই ঠুলি উন্মোচন

করার ধৃষ্টতা দেখায় আবার সুবর্ণলতা ল স্পষ্ট জানায় এবারে বিলিতি কাপড় কানা চলবে না। কিন্তু কে কবে গুরুত্ব দিয়েছে সুবর্ণর পাগালামিকে। ফলে যথারীতি বিলিতি কাপড়ই আসে। আর আসে আলতা, চিনে সিঁদুর, মাথা ঘষার মশলা। এরপর যা করে সুবর্ণলতা তা দুঃসাহসিক। একটু নাটকীয় ও বটে। অবশ্য এ তার চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তার সমস্ত কাজই তো একইযোগে এমন বিধ্বংসী ও গঠনমূলক। পুরনোকে ধ্বংস করা - নতুনকে আবাহন করে আনা। বিলিতি কাপড় সব পুড়িয়ে ফেলে সে। প্রভাসকে জানায় এ বাড়ির পুরুষদের চেয়ে হরিদাসীর ভাই অনেক উঁচুদরের মানুষ। এত সাহস কোথায় পায় সুবর্ণ? কেবলই চরিত্রগত দৃঠতার জন্য ? মরার বাড়া গাল নেই - একাধিকবার আত্মহত্যার চেষ্টা, প্রকাশ্য রাস্তায় দুলোকে বাঁচানো - এসবই পর্যায়ক্রমে ঘটে। ফলে খুব একটা অবিশ্বাস্য নয় এ কাজ। কিন্তু অন্য একটি অন্তর্নিহিত কারণও থাকে। তাহল অর্থগত। তার বরের রোজগার বেশি। গয়না সম্পদ কম নয় তার। সর্বোপরি স্বদেশি হওয়ার মধ্যে সেদিন এক অভিজাত্যও ছিল। 'হেরেও কোন উপায়ে জিতে যায় সুবর্ণ, মার কেতে গিয়েও মাথায় চড়ে বসে, এ এক অদ্ভুত রহস্য।' 'যে যতই তড়পাক, শেষ পর্যন্ত কোথায় যেন ভয় খায়।' 'আর বিজয়িণি সুবর্ণলতা খানিকটা করে এগিয়ে যায়।' কারণগুলো খুব সোজা, অর্থ, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও ঔদার্য, যুক্তিবোধ এবং অবশ্যই সময়ের গমণশিলতা। সুবর্ণলতা পিছনে হাঁটেনি।যুগের অগ্রগতির সঙ্গে চলেছে। বাইরের লড়াই ও পরিবর্তনটাকে সে কেবল অন্দরে এনেছে। ফলে তার কোনো কাজকেই অবিশ্বাস্য মনে করার কারণ ধাকে না। কারণ এ ভাঙ্গনটা ঐতিহাসিক সত্য। সমাজের উঁচুতলার পরিবর্তনের অঙ্গ। এই গৌরবে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করা যায়। সুবর্ণ তাই বাড়িসুদ্ধ ছেলেমেয়ে ও ননদ বিরাজকে নিয়ে গাড়ি ভাড়া করে মেলায় নিয়ে যাব। কিনে আনে স্বদেশি জিনিষ। সবাইকে বিলোয়। আর আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে বলে - আসছেবার আমিও মেলায় দোকান দেব।'

এই কাজ করে সবর্ণ আলোর দিশা পায়। ভাবে কানু ভানু দুই ছেলে বড় হয়ে গেলে তাদের অবলম্বন করে বহির্জগতের স্বাদ নিতে সে বেরিয়ে পড়বে রাজপথে। একদিন কাশী যাবে মাকে দেখতে। প্রবোধ তো তাকে নিয়ে গেল না খনো। তারপর ক্রমাগত প্রবোধের অপদার্থতার পরিচয় পেতে থাকে। ধিক্কার খেয়ে তাড়া কাওয়া জন্তুর মতো পালায় প্রবোধ। অথচ সুবর্ণ চায় পুরুষের মতো জ্বলে উঠুক প্রবোধ। কিন্তু সুবর্ণও কিই অপদার্থ হয়ে যাচ্ছে না?

> "তার মধ্যেই কি পদার্থ থাকছে আর ? যেটুকু ছিল, এই আত্মঘাতী সংগ্রামে ক্ষয় হয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে না ? তার নিজের ভিতরকার যে

টিপ্পনী

সুরুচি, যে সৌন্দর্যবোধ এই কুশ্রী পরিবেশ থনেকে মুক্তি পাবার জন্যে সর্বদা ছট্‌ফট্‌ করে মরতে, সে যে প্রতিনীবত এই নিষ্ফল চেষ্টায় বিকৃত হয়ে উঠেছে,সে বোধ কি আর আছে সুবর্ণলতার ? এই বাড়ি আর এই বাড়ির মানুষগুলোর অসৌন্দর্য ঘুচিয়ে ছাড়াবার জন্যে নিজে সে কত অসুন্দর হয়ে যাচ্ছে দিনদিন, একথা তাকে কে বুঝিয়ে দেবে।'

টিপ্পনী

আর এই কুশ্রীতা থেকে সরে গিয়েই সুবর্ণর যাবতিয় সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটে। অন্য পরিবেশে সে নিজেও যেন সুরভিত হয়ে ওঠে। তিনটে ছেলেমেয়ে নিয়ে একজন ঝি নিয়ে ভরসন্ধ্যেয় ঘোড়ার গাড়ি করে মামীশাশুড়ীর বাড়ি উপস্থিত হয় সুবর্ণ। সত্যনারায়ণ পুজোতে। অন্য এক পরিবেশে সুবর্ণও হয়ে ওঠে অন্য জগতের মানুষ -

"ফুলের গন্ধ, ধূপের গন্ধ,আর সদ্য কাটা তাজা ফলের গন্ধ বাড়িটাতে যেন দেবমন্দিরের বাতাস পৌঁছে দিয়ে গেছে। আর দরজা থেকে সুনিপুণ আলপনার রেখা যেন তার সুষমাময় স্বপ্ন নিয়ে অপেক্ষা করছে দেবতার আবির্ভাবের।

অনাস্বাদিত এই স্বাদ সুবর্ণকে যেন স্বর্গালোকের দোরে পৌঁছে দেয়। মোহময় সৌন্দর্যময় সৌরভময় এই পরিবেশ আচ্ছন্ন করে ফেলে সুবর্ণকে। শ্যামাসুন্দরীর বাক্‌ভঙহগি, মিস্টতা, ঘরের পরিসর, অলৌকিক সুন্দর নির্জনতা, ক্লেদাক্ত বিশ্রী ভিড়ের অনুপস্থিতি, ভক্তদের শান্ত যুক্তকর, ধুপধুনো ফুল চন্দন - সুবর্ণলতা নিজেকে আবিষ্কার করার অবকাশ পায় যেন। তার ছেলেমায়েরাও চ্যাঁ ভ্যাঁ, ঠেলাঠেলি, হাসাহাসি, অসভ্যতা, লোলুপতার পরিবর্তে চুপ করে জোড় হাতে বসে আছে। বাড়ি ফিরে সুবর্ণ আবিষ্কার করে সেই নরকের কদর্যতম আর এক রূপকে। তার চরম প্রকাশ।

সুবর্ণর উজ্জ্বলতম বিকাশ, মহত্তম অভিব্যাক্তি, বমন্ধন-মুক্ত বিহঙ্গের মতো নভোচারিতা, নিজেকে অসীম ও বৃহতের সঙ্গে অন্য এক সুশৃঙ্খল বন্ধনের মেলানো মনের মুক্তি, প্রাণের উচ্ছাস, হৃদয়ের প্রসারতা দেখাতে তার চরিত্রের মধ্যাহ্ন দীপ্তিকে প্রকাশের জন্য তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ে অন্য এক পরিবেশ। অন্য কিছু মানুষ। ধন নয়, সম্পদ নয়, অভিজাত্য নয়, রিদ্র ও গ্রাম্য কিছু মানুষ আর প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্য। কিন্তু মনে ও অন্তরে যা অনেক বড় ও সুদূর প্রসারিত - সেই প্রকৃতি ও অমূল্য জীয়নযাত্রার সংস্পর্শে সুবর্ণর জীবনের প্রকাশ দেখান লেখক। তাঁকে পাঠিয়ে দেণ চাঁপতায়। দরিদ্র ননদ সুবালার গ্রামের বাড়িতদে। দর্জিপাড়ার সেই সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র মন ও মানুষ ভরা, চিৎকার ভরা স্থান ত্যাগ করে তাকে

আনতে হয় গ্রামের বিস্তীর্ণ শ্যামলতা ভরা প্রাকৃতিক পরিবেশে আর আনতে হয় সুবালার সরল অনাড়ম্বর অথচ অন্তর ঐশ্বর্য সমৃদ্ধ পরিবারে। আনতে হয় অম্বিকার বৃহত্ত্র জীবনযাত্রার, দেশপ্রেমের, পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের, দেশমাতৃকা ও একই সঙ্গে নারীমুক্তির আধুনিক মননের সংস্পর্শে। যার পবিত্র শিখার আলোকে সুবর্ণ আলোকিত হয়, বিকশিত হয়, হয় সুদূরের অভিসারী। সুবর্ণর অন্তরের ঐশ্বর্য, স্বপ্ন আকাঙ্কা সবই যেন সুবালার সংসার আর অম্বিকার বন্ধনহীন বৃহত্তর সংসারের স্পর্শে উদ্ভাসিত হয়। সুবর্ণ যেন নিজেকেই আবিষ্কার করে এখানে। খুঁজে পায় জীবনের যথার্থ মূল্য ও সার্থকতাকে। যদিও তার জন্য কম মূল্য দিতে হয়নি তাকে।

টিপ্পনী

চোখ জুড়োচ্ছিল রেলগাড়িতে উঠে পর্যন্ত। তার পিতৃভূমিও ছিল গ্রাম। তার শৈশবের গ্রাম। সেই এমনি ছায়া সুশ্যামল নিভৃত শীতল বাংলার পল্লীগ্রাম। যদিও সুবর্ণর স্মৃতিতে সে ছায়া কেবল অন্ধককার। সে শ্যামলিআয় দাবদাহ। সুবর্ণর জীবনের অভিশাপ সেখানে। তবু এই মাঠ, পুকুর, ফল, বাগান, ছোটো ছোটো ঝোপঝাড়, স্নেহের স্বাদ যোগাচ্ছিল। এমনকি এও মনে হয় তার - খাস কলকাতার বউ না হয়ে সে যদি এরকম এক গ্রামের বৌ হত!

সুবর্ণর আবির্ভাব কারও সুখ বয়ে এনেছে এ অনুভূতি নতুন। সুবর্ণর মন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। ওই হাতে পায়ে শির ওঠা, শীর্ণ মুখ, পাতলা চুল, প্রায় বাসনমাজা ঝিয়ের মতো চেহারার মানুষটার মধ্যে এক সচ্ছ পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি শক্তি। সবচেয়ে বড় কথা সুবর্ণকে বুঝতে পারে ও। সুবর্ণও তো বোঝে অনেক কিছু। অম্বিকার স্পর্শে সে সন্ধান পায় অন্য জীবনের। তার বীজ অবশ্য সুবর্ণর মধ্যে নিহিত ছিল। বাড়ির কাজের লোকদের পক্ষচ নিয়ে যে বলত - 'গরীবরা কি মানুষ নয় ? .... ছোটোলোক কথাটা কারুর গায়ে লেখা ধাকে না, ব্যাভারেই ছোতলোক ভদ্দরলোক ! ..... মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে বলেই কি আমরা ওর মাথা কিনে নিয়েছি ? ও কাজ দিচ্ছে আমরা পয়সা দিচ্ছি, হয়ে গেল শোধ বোধ। কিংবা কারো সঙ্গে বন্দোমাতরম' পাতানোর বাসনা। বিরাজকে অলংকার দেওয়া কিংবা পরিবারের সকলের প্রতি তার সমান ব্যবহার - সুবর্ণ যদি সাবান কাচে তো বাড়িসুদ্ধ সবাইয়ের বিছানায় ওয়াড় খুলে এনে ফর্সা করে, জুতো সাফ করলে সব জুতোই কালি পড়ে, ছেলেরা কোনো জিনষের বায়না করলে বাড়ির সব ছেলেকে দিয়ে তবে নিজের ছেলেকে দেয়। তার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অম্বিকার সংস্পর্শে জাগা দেশমুক্তি নারীমুক্তি ও ব্যাক্তিমুক্তির আকাঙ্খা তাই সহজে মেলে। ছেলেমেয়েদের হাতে পয়সা দেয়না। যা দরকার তাই আনে এবং 'গুটিসুদ্ধ' সকলের জন্য আনে সন্দেহবাতিক, স্বার্থপর প্রবোধও সুবর্ণর এই গুণকে স্বীকার করে আর

চাঁপা অসন্তুষ্ট হয় - তার বাবার বেশি পয়সা তার জন্য আলাদা সুখ নেই তাদের।

সুবালার সংসার, শাশুড়ীর ভূমিকা, শাশুড়ী - বউ সম্পর্কে, কথোপকথোন, স্বামীর কথা সই সুবর্ণর কাছে নতুন জগৎ বলে প্রতিভাত হয়। জগু ভাসুরের বাড়ির পূজা-গন্ধ আকুল করেছিল যেমন, দরিদ্র একগাদা 'এন্ডি গেন্ডি'র সুবালার কোলাহল ভরা সংসারও তেমনি পবিত্র মনেহয় তার কাছে। স্ত্রীর প্রতি অমূল্যর মনোভাব স্ত্রৈন্যের নয়, সম্ভ্রমের। ঝি চাকরের পাট নেই - সব কাজ সুবালাই করে।

টিপ্পনী

আর অম্বিকা ? কুব তাড়াতাড়ি সুবর্ণ আকৃষ্ট হয় তার প্রতি। বিমোহিত হয়। রোদে পোড়া রুক্ষ কালো শীর্ণ একটা ছেলে, তবু তাকে দেখলে সুবর্ণর মনটা আহ্লাদে ভরে ওঠে। তাকে অনেক উঁচু স্তরের মানুষ মনে হয়। মনে হয় কী সুন্দর ! এ পরকীয়া নয়। সুবর্ণর যে মন বৃহতের দিকে ডানা মেলেছে - অম্বিকাতে তার মূর্ততা, সুবর্ণ তাকেই স্পর্শ করতে চেয়েছে। তাই অম্বিকার 'বিদূষী' স্বীকৃতিতে, বাংলার গরে ঘরে এমন নারীর আকাঙ্কায় সুবর্ণর খাতে এসে পড়ে আবেগের বন্যা। খুঁটিবে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে বসে স্বদেশি ছেলেদের কথা। তাদের কার্যকলাপ, পদ্ধতি, সাফল্য, দেশ উদ্ধারের সঙ্গে নারীমুক্তি বভাক্তি স্বাধীনতা সব যেন হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ে সুবর্ণর মধ্যে। মায়ের আকাঙ্কা আর বক্তব্যের প্রতিচ্ছবি যেন সে দেখে অম্বিকার মধ্যে। মাই যে সুবর্ণর এই ভাবনা চিন্তার উৎস একথা বুঝতে পারে অম্বিকার। আর 'পদ'র নাম শুনে উথলে ওঠে সুবর্ণলতা। দেখতে চায় অম্বিককা ঠাকুরপোর সব কবিতা, তা করতে গিয়ে সে পায় বই, পত্র পত্রিকা, ধূলো মাখা। তারমধ্যেই মাণিক্য খোঁজে। খোঁজে অম্বিকার মধ্যেও। 'আর পাঁচজনের থেকে তফাৎ বৈকি অম্বিকা। তার পরিমন্ডলের একতা নির্মল পবিত্রতা। তার অন্তরে একটা অসঙ্কোচ সরলতা। তার কাছে সুবালা আর সুবর্ণলতা একইপর্যায়ের গুরুজন।'

এই কৈফিয়ৎটুকু দিতেই হয়। কারণ বিমলার মতো সুবর্ণকে উগ্র স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত দেখাতে চাননি লেখিকা ল সুবর্ণলতার বন্ধন আরো পুরনো, আরো বভাপক / তার থেকে বেরোনোই তার এখনকার সমস্যা। তাই 'ওই শোনো শোনো সাড়া জাগিয়াছ / কালের ঘূর্ণিপথে। ভাঙনের গান গেয়ে ছুটে আয় / মরণের জয় রথে।' তাই সুবর্ণোলতা বলে - 'এতো শুধু পরাধী দেশে কথাই নয়। এযে আমাদের মতন চিরপরাধীন মেয়েদের কথাও। কী করে লিখলে তুমি ?'

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

কিন্তু সুবর্ণলতার ভাগ্যে নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব অনাবিল কিছু পাওয়া কি কখনো ঘটে ? অতই কি সহজ জীবন নারীদের এই সমাজে। তাই ঐ মঞ্চে ঐ সময়ে আবির্ভাব ঘটে

প্রবোধের। বাকি দৃশ্য - সংলাপ-প্রতিক্রিয়া অণুমান করে নেওয়া যায়। আর সুবর্ণলতাকে সেই সময়েই সমস্ত ভৎসর্ণা, অপমান, নিন্দা, তিরস্কার সহ্য করে ফিরতে হয় প্রবোধ ও মুক্তকেশীর সংসারে। কিন্তু অম্বিকাকে সে জানিয়ে দিয়ে আসে - 'এই মেয়েমানুষ জাতটাকে যতদিন না এই অপমানের নরককুন্ডু থেকে উদ্ধার করতে পারবে, ততদিন সব চেষ্টাতে ভস্মে ঘি ঢালা হবে।'তবু তাকে বুঝলেন গ্রামের অশিক্ষিতা এক বৃদ্ধা - সুবলার শাশুড়ি 'সুবর্ণর মতন মেয়ে সংসারে দুর্লভ। কিন্তু সবাই তো ওকে বুঝবে না। একা বেটাছেলের বাড়িতে যেতে নিন্দে, এ বোধই নেই ওর। গঙ্গাজলে ধোয়া মন ওর।'

টিপ্পনী

এরপরেও তো তাকে প্রবোধের সংসারে ফিরতে হয়, বউ হয়ে থাকতে হয়। মা কি তাকে ধিক্কার দিচ্ছে ? না। সুবর্ণ জানায় সত্যবতীর সঙ্গে তার অবস্থান অনেক ফারাক। সত্যবতীর বাবা সত্যবতীর জীবনের ধ্রুবতারা। সত্যবতী মেরুদন্ডের শক্তি। আর সুবর্ণর পৃষ্ঠপটে বিবর্ণ ধূসরতা। বাবা তার প্রতারণার ছবি। আর স্বামী ? সত্যবতীর স্বামীঅসার অপদার্থ ছিল কিন্তু অসভ্য অশ্লীল ছিলনা। কিন্তু সুবর্ণর স্বামী অসভ্য অশহলীল অত্যাচারী। তাছাড়া সত্যবতী তার মেয়কে অনাধ করে দিয়ে গেছেন। স্বপ্ন ভাঙার বেদনায়। সুবর্ণ কি তাই করতে পারে ? কিন্তু সুবর্ণ হয়তো একদিন তার সন্তানের মধ্যে সার্থক হবে। মাথা তুলে দাঁড়াবে পৃথিবীর সামনে। সেই স্বপ্নই দেখে সুবর্ণ। সেই ভবিষ্যতের ছবিতেই রঙ দেয়।...'

অম্বিকার সামনেই প্রবোধ স্বতূপ উন্মোচিত করেছিল। অশ্লীল ভাষা কদর্য ইঙ্গিত। কি্তু অম্বিকা দমেনি তাতে। অমূল্যর হাত দিয়ে সে পাঠিয়ে দিয়েছিল পুচরনো পত্র পত্রিকা বইজ। আই সংসারে আঘাত খেয়ে সুবর্ণ তাতেই আশ্রয় নেয়। খুঁজে পায় হারিয়ে যাওয়া কবিতার পৃষ্ঠা - অম্বিকা খুঁজে দিয়ে পাঠিয়েছে। অশ্রুসজল হয় সুবর্ণ - 'সুবর্ণর জন্যেও পৃথিবীতে শ্রদ্ধা আছে, সম্মান আছে, প্রীতি আছে। নির্মল ভালোবাসার স্পর্শ আছে। তবে পৃথিবীর উপর একেবারে বিশ্বাস হারাবে কেন সুবর্ণ ? কেন একেবারে হতাশ হবে ?' আর নিজে হেরে - আর সকলে যা ভাবে যা করে সুবর্ণও তাই করেছে -

"সুবর্ণর গর্ভ জাত সন্তানদের কি মানুষের পরিচয় দিতে পারবেনা সুবর্ণ ? যে মানুষ পৃথিবীর উপর বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারে, আশা ফিরিয়ে আনতে পারে, তেমন মানুষ ?

যদিও ভেবেছে সুবর্ণ এই পরিবেশে তাও কি সম্ভব ?

সুবর্ণর প্রয়াস তবু থেমে ধাকে না। সমস্ত অপমান, নিষ্ঠুর আঘাত সুবর্ণ মেনে নেয়। কিন্তু মানে না থেমে থাকে। সে এগোতে যায় - এগোয় - ! আবার বাড়ির ছোটোদের নিয়ে

টিপ্পনী

পদ্য শেখায় - 'বল বল বল সবে, / শত বীণা এণুরবে, / ভারত আবার জগৎ সভায় / শ্রেষ্ঠ আসন লবে।' প্রভাস যখন বলে এ ভিটেয় বসে এত বাড়াবাড়ি চলবে না তখন সুবর্ণও জানিয়ে দেয় সকলের ওপর কি প্রভাসের শাসনই চলবে আর কারুর কোনো ইচ্ছেই চলবে না ? শুধু তাই নয় রান্নার পালা অগ্রাহ্য করে সদ্যোজাত মেয়ের যত্ন নেয় সে। স্বামী শাসন করতে এলে জানিয়ে দেয় - একটু কাঁদলে মেয়ে যদি মরে না যায় 'একটা রাতে না খেলেও কেউ মরে যাবে না।' উমা শশীর দাসত্ব মুক্ত করতে শাশুড়ীকে অগ্রাহ্য চরে রাঁধুনী নিয়োগ করে সুবর্ণ। জানায় - 'হুকুম, চালাচালির কথা নয় মা ! অবুঝের মতন কতা করলে তো চলবে না। দিদি একা আর কতদিক দেখবেন ? বামুনের মেয়ের কথা আমিই বলে পাঠিয়েছি।'

যে ছেলেরা বড় হলে সে পৃথিবী ঘুরে বেড়াবে বলে স্বপ্ন দেখেছিল - তার সামান্য অংশও কি পূরণ হয়ে ছিল ? প্রথমে তো এলো পারু বকুকে ভর্তি করার কাজ। বড় ছেলের উপর আস্থা রেখে বলেছিল - তোর বাপের দ্বারা হবে না - তোরা বড় হয়েছিল। তোরা নিবি ভার। কিন্তু ভানু জানিয়েছিল - পারুর মতো ধিঙ্গি মেয়েকে প্রাইমারী স্কুললে ভর্তি করা লজ্জাকর। নাটক নভেল পড়া পদ্য লেখা - এই ঢের। ভানু মাকে ভয় করে বলেই বাইরে সহস দেখায়। কিন্তু সুবর্ণ তো অনেক আত্মস্থ হয়েছে এতদিনে। তাই ক্ষোভে ফেটে পড়ে না সে। ভানু এই কাজটা পারবে কিনা সেতাই জানতে চায়। তাছাড়া সুবর্ণর ইচ্ছে ছিল তার ছেলেরা বাড়ির ঐ অকালবৃদ্ধ কর্তাদের ভাষা থেকে অন্য ভাষা কথা বলবে। যে কথার ভাষা হবে মার্জিতক, সভ্য, সুন্দর। যাতে থাকবে তারুণ্যের ঔজ্জ্বল্য, কৈশরের মাধুর্য, শৈশবের লাবণ্য।

বড় মমতায় আঁকা আশাপূর্ণার সুবর্ণ। সংগ্রামের জন্য জবন নয়। জীবের জন্য সংগ্রাম। কিন্তু তা কি স্বাভাবিক সুস্থ রাখে মানুষকে ? তার মানবিক গুণকে কি ধ্বংস করে দেয়না অনেক খানি। কঠিনের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য কঠিনই কি হতে হয়না নতুন পথের দিশারীকে ? সুবর্ণলতাকে তাই হতে হয়েএ। তবু সেই তো নতুনের সবপ্ন দেখে যার হৃদয় সুদূরের অভিসারী, নবীনের পূজারী, মুক্তি ও সৌন্দর্য্যের দিশারী। সুবর্ণর যুগ শেষ হয়ে গেছে ? যে যন্ত্রনা মাথা কুটে মরেছিল সুবর্ণলফতা তার কি অবসান হয়েছে ? "হয়তো বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও সভ্যতা আর প্রগতির চোখ ঝলসানো আলোর সামনে সাজিয়ে রাখা রঙচঙে পুতুল মেয়েদের পিছনের অন্ধকারেআজও কোটি কোটি মেয়ে এমনিভাবে মাথা কুটে কুটে প্রশ্ন করছে - কেন ? কেন ? নারীমুক্তি হয়নি। যা হয়েছে বিশ্বে ভোগবাদী দুনিয়ার ভোগের স্বাধীনতা। যেখানে মানবাত্মার অপমান, নারীত্বের নিত্য অসম্মান। বস্তুত যথার্থ নারীমুক্তি ঘটে মানবমুক্তির পথ ধরেই। প্রচলিত ভোগবাদী সমাজের বুর্জেয়া কাঠামোর

প্রদত্ত নারী স্বাধীনতাকে কখনোই নারীমুক্তি বলতে চাননি লেখিকা। তাঁর 'বকুলকথা'র কয়েকটি চরিত্র দেখলেই তা বোঝা যাবে। আর সুবর্ণলতা তো দরিদ্র নয় ধনী। মোট কথা সুবর্ণর আকাঙ্খার মধ্যে যথার্থ আধুনিক চিন্তাই প্রাধান্য পেয়েছে।

একটা কথা স্পষ্ট বলা যায় আশাপূর্ণার সুবর্ণলতারা পুঁজিবাদী ভোগের মধ্যে স্বাধীনতা খোঁজেনি তাকেই স্বাধীনতা বলে মনে করেনি। তারা চচেয়েছে আত্মমর্যাদা, আত্মসম্মান যাবতীয় দাসত্ব ও প্রভুত্বের অবসান, চেয়েছে সমাজের মুক্তি ও মানুষের মুক্তির মাঝেই নিজের মুক্তি খুঁজতে। তাই তারা বলতে পারে 'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি/ জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।' এই জগতের সঙ্গে সংলগ্ন ও সম্পৃক্ত হয়ে যাবতীয় বন্ধন, দাসত্ব, অসুন্দর, কদর্যতা, স্বার্থপরতা, মোহ, ভোগ, বিপাস, এসব থেকে জগৎমুক্তির যজ্ঞের অংশীদার হবে নিজের মুক্তির যথার্থ কামনা করেছে তারা। তথাকথিত মননশীল ও আধুনিক পাঠক সমালোচকরা আশাপূর্ণার এই সম্পূর্ণ সামগ্রিক ভাবনার, তার গল্প ও চরিত্রে দেখতে পাননা কেন? ননদের বিয়েতে বা শাশুড়ীর কাজে অবহেলায় গয়না ত্যাগ, সুবালার জীবনের সঙ্গে আত্মীয়তা উপলব্ধি, পুন্যিপিসির নাতনির সঙ্গে ছেলের বিবাহ - সব একসূত্রে গাঁথা। একই ভাবনার সামঞ্জস্যপূর্ণ অভিব্যাক্তি। সুবর্ণলতা দাসত্ব বন্ধন মোচনের আকাঙ্খার নাম নয় যৌথ ও যথার্থ জীবন মুক্তির আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের পূজার অন্য নাম। সুবর্ণলতার লড়াই ও স্বপ্ন তাই মানবমুক্তির শেষ যুদ্ধ পর্যন্ত স্মরণীয় ও প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবে। থাকবেন আশাপূর্ণাও।

প্রশ্নমালা :

১. সুবর্ণলতা কোন শ্রেণীর উপন্যাস?

২. সুবর্ণলতা উপ্যাসের সুবর্ণলতা চরিত্রটি আলোচনা কর।

৩. সুবর্ণলতার শাশুড়ীর চরিত্রটি ব্যাখ্যা করো।

৪. সুবর্ণলতার স্বামীর চরিত্র আলোচনা কর।

৫. সুবর্ণলতা উপন্যাসের সমাজচিত্র বর্ণনা করো।

টিপ্পনী

টিপ্পনী